প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৫৯

পাণ্ডুলিপি : গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

মুদ্রণ : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

JIBANI GRANTHAMALA : A series of literary biographies

MUNSHI SHEIKH JAMIRUDDIN by Abul Ahsan Chowdhury Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : Magh 1395/

প্রসঙ্গ-কথা

সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে কবি সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকদের প্রামাণ্য জীবন-কথা অপরিহার্য উপাদান হিসাবেই বিবেচিত। বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস রচয়িতাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'জীবনী গ্রন্থমালা' শীর্ষক যে-প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন, আমাদের বিশ্বাস, এ-ক্ষেত্রে অনুভূত দীর্ঘদিনের শূন্যতা, অংশত হলেও, পূরণ করবে। বাংলা ভাষার এক শ' জন বিশিষ্ট লেখকের জীবনী এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। গত দু'বছরে ষাট জন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন আরো তেত্রিশ জন স্মরণীয় সাহিত্যশিল্পীর জীবনালেখ্য।

মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের ধর্মজীবন বিচিত্র ঘটনার সঞ্চয়ে সমৃদ্ধ। তিনি অতি নবীন বয়সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন মিশনারীদের প্রভাবে—আবার পরিণত বয়সে আপন ভ্রান্তি উপলব্ধি করে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর প্রাণবন্ত বাগ্মিতায় ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বাঙালী মুসলমান সমাজে খৃষ্টান প্রচারকদের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। বহুসংখ্যক গ্রন্থপ্রণেতা শেখ জমিরুদ্দীন শুধুই বাগ্মী ছিলেন না, লেখক হিসাবেও তিনি ছিলেন শক্তিমান।

জনাব আবুল আহসান চৌধুরী বর্তমান গ্রন্থে মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের জীবন-কথা বিশদভাবে পরিবেশন করেছেন।

এই গ্রন্থমালা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল সহকর্মীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচী



মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন

জীবন-কথা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ও বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাঙালী মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অবক্ষয়-রোধে যাঁরা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীনের (১৮৭০-১৯৩৭) নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মুসলিম-জাগরণের উন্মেষ-পর্বে তাঁর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। অন্যান্য ধর্ম-প্রচারক ও সমাজকর্মীদের তুলনায় জমিরুদ্দীনের আবির্ভাবের তাৎপর্য ছিলো ভিন্ন প্রেক্ষা-পটে গুরুত্বপূর্ণ। স্ব-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামনা এবং স্ব-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও তার মর্যাদা সংরক্ষণের প্রয়াস ছিলো তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং তা রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁকে এক প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয়। এ অসাধারণ কর্মী-পুরুষ স্বকালে উপেক্ষিত ও উত্তরকালে প্রায়-বিস্মৃত একটি নামে পরিণত হয়েছেন। মুন্‌শী জমিরুদ্দীন যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন সে প্রেক্ষাপট আজ বিদ্যমান না থাকলেও, সমাজ-জীবনের ক্রান্তিকালে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের কারণে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায় নি।

পরিবেশ-পটভূমি

মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের জন্মস্থান মেহেরপুর-অঞ্চল অখণ্ড নদীয়ার একটি প্রাচীন জনপদ। এক গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এ অঞ্চল। মেহেরপুরের প্রাচীন ইতিহাস ও নামকরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে মেহেরপুরের উৎপত্তি। কারো ধারণা, বচনকার মিহির-খনার আবাস ছিলো এ স্থান এবং মিহিরের নামানুসারে 'মিহিরপুর', তার থেকে 'মেহেরপুর' নামের উদ্ভব।[১] আবার অপরপক্ষে জনশ্রুতি আছে, ষোড়শ শতকে মেহের আলী শাহ নামে এক দরবেশ এ শহর পত্তন করেন[২] এবং 'মেহেরপুর' নাম তাঁরই স্মৃতি বহন করছে।

মেহেরপুর অঞ্চল তার পার্শ্ববর্তী কিছু গ্রাম নিয়ে কালক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে, নির্মিত হয় ঐতিহ্যের এক স্মরণীয় অধ্যায়। মেহের-পুরের নিকটবর্তী বাগোয়ান মোগল আমলে 'প্রসিদ্ধ পরগণা' ছিলো। এ বাগোয়ান গ্রামেরই দুর্গাদাস সমাদ্দার "পরবর্তীকালে মোগল-অনুগ্রহে নদীয়ারাজ হন এবং নাম হয় ভবানন্দ মজুমদার।"[৩] ভবানন্দ বাগোয়ান গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন, পরে মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।[৪] মীর্জা নাথানের 'বাহারীস্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে ও রায়গুণাকর ভারত-চন্দ্র রায়ের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এ বাগোয়ান গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ ইরফান হাবিবের 'An Atlas of Mughal Empire—Political and Economic Maps with detailed notes, bibliography and Index' গ্রন্থে বাগোয়ান-সম্পর্কিত তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

মেহেরপুরের ইতিহাসের আরেক অধ্যায় জুড়ে আছে নবাব আলীবর্দী খাঁ (১৬৭৬-১৭৫৬) আর গোয়ালা রাজাদের কাহিনী। কথিত আছে:

> ...১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ মেহেরপুরের নিকট-বর্তী বাগোয়ান গ্রামে শিকারের উদ্দেশ্যে আসেন। প্রত্যাবর্তন-কালে দুর্যোগের জন্য তিনি রাজু ঘোষানী নামক এক গোয়ালা নারীর আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। রাজুর সরল আতিথেয়-তায় প্রীত হয়ে নবাব রাজপুর গ্রাম রাজু ঘোষানীর গো-চারণের জন্য দান করেন। রাজু ঘোষানীর পুত্রকে রাজা উপাধি দেওয়া হয় ও তিনি রাজা গোয়ালা চৌধুরী নামে খ্যাত হন। রাজা গোয়ালা চৌধুরীর সময় হতেই মেহেরপুরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই-সময়ে বাংলা মুল্লুক মারাঠা বর্গীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। মেহেরপুরের শ্রীবৃদ্ধি অচিরে বর্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্গীরা বারবার মেহেরপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। অবশেষে বর্গীদের হাতে রাজু ঘোষানীর বংশধরেরা নির্বংশ হন। তাঁদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।[৫]

মেহেরপুরের আমদহ ও বল্লভপুরও প্রাচীন ঐতিহ্যের দাবীদার। পুরা-কীর্তির ধ্বংসস্তূপ এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করছে। মেহেরপুর অঞ্চল একসময় নাটোরের রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিলো। তারপর

কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ কুমারের হাতে এই বিস্তৃত জমিদারীর দখল আসে। পরে তাঁর পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ জেমস হীল নামের এক কুখ্যাত নীলকরকে এই ডিহি মেহেরপুর পত্তনি দেন।[৬] মেহেরপুরের 'মল্লিক' ও 'মুখোপাধ্যায়' বংশও নানাকারণে মেহেরপুরের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।[৭]

নীলচাষ ও নীল-হাঙ্গামার জন্য মেহেরপুরের নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। জানা যায়:

> মেহেরপুর অঞ্চলে সেকালে বিস্তর নীলকর সাহেব বাস করিতেন, মেহেরপুরের ফৌজদারী আদালতে তাঁহাদের মামলা-মকর্দ্দমার বিরাম ছিলনা। অধিকাংশ মামলাই নীলসংক্রান্ত, সুতরাং নীলকর সাহেবদের স্বার্থ সেই সকল মামলার সহিত বিজড়িত ছিল।[৮]

মেহেরপুরের আমঝুপি, বিদ্যাধরপুর, কসবা, ভাটপাড়ায় প্রধান নীলকুঠিগুলো অবস্থিত ছিলো। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর নীলের কারবার মেহেরপুব মহকুমায় বিস্তৃত ছিলো এবং আমঝুপি নীলকুঠি ছিলো এই অঞ্চলের সদর দপ্তর। নীল-আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও মেহেরপুর সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলো।

মেহেরপুর, করিমপুর, গাংনী ও তেহট্ট—এ চারটি থানার সমন্বয়ে মেহেরপুর ১৮৫৮ সালে মহকুমার মর্যাদা লাভ করে। এ মহকুমার প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৬৯--১৯৪৩) স্মৃতিচারণায় জানা যায়:

> স্বর্গীয় রামগোপাল সান্যাল মহাশয়ের একখানি ইংরাজী কেতাবে পড়িয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন, নদীয়া, মেহেরপুর অনভিজ্ঞ ছোকরা সিভিলিয়ানদের শিক্ষা-নবিশীর স্থান। কথাটা সত্য; বিলাত হইতে ইংরাজ সিভিলিয়ানগুলি এ দেশে আসিয়া দিনকতক এসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে শিক্ষা-নবিশী করিয়াই জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে মেহেরপুর মহকুমার ভার পাইতেন।... স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ জে. ডি. এণ্ডারসন, এফ. এ. শ্ল্যাক, পি.জি. মেলিটস্ প্রভৃতি সিভিলিয়ানরা মেহেরপুরে প্রশংসার সহিত হাকিমী করিয়াছিলেন। অনেকেই হয়তো জানেননা—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেহেরপরে হাকিমী করিতে করিতে

তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণে'র রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সে বোধহয় ১৮৬৮–৬৯ খৃষ্টাব্দের কথা।[৯]

মেহেরপুরে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব আর যাঁরা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যার এ্যান্টনী ম্যাকডোনাল্ড (পরবর্তীকালে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর), এইচ. হলমউড (পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ১৮৬৯ সালে মেহেরপুরে পৌরসভা গঠিত হয়। ১৮৯২ সালে চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ১৮৯৭ সালে পুনরায় পৃথক হয়।

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও মেহেরপুরের অবদান উল্লেখ করার মতো। উনিশ শতকে এ-অঞ্চলে নারীশিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষা-প্রসারে খ্রীস্টান মিশনারীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫০ সালের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, মেহেরপুরের রতনপুর মিশনের (১৮৪০) তত্ত্বাবধানে ৭টি ভার্নাকুলার বালক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা ৪০৯) ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রীসংখ্যা ৬৯) এবং বল্লভপুর মিশনের (১৮৪৮) তত্ত্বাবধানে ৪টি ভার্নাকুলার বালক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা ২১০) ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রীসংখ্যা ৬৯) পরিচালিত হতো।[১০] ১৮৫৯ সালে স্থাপিত হয় মেহেরপুর হাই ইংলিশ স্কুল। 'নদীয়া-কাহিনী'-সূত্রে (পৃঃ ১৭১) জানা যায়, ইসলামী-শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুরের মক্তবটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলো। উনিশ শতকেই মেহেরপুরে ক্ষুদ্রাকারের একাধিক গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিলো।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় "নদীয়ার মহারাজ গিরিশ-চন্দ্রের সভার প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক স্বভাবকবি" 'রসসাগর' কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর (১৭৯১-১৮৪৪)। ইনি মেহেরপুরের বাড়েবাঁকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র-বিশারদ সাহিত্যিক জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬-১৮৯২), বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সংকলক রমণীমোহন মল্লিক, 'পল্লীচিত্র' 'পল্লীবৈচিত্র্য' ও 'রহস্যলহরী' গোয়েন্দা-সিরিজের স্রষ্টা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের জন্ম মেহেরপুরেই। মেহেরপুরের কুতুবপুরের সাধক নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস (১৮৮০-১৯৩৫) হিন্দুধর্মশাস্ত্র বিষয়ে অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম সাহিত্যসেবীদের মধ্যে মহম্মদপুর গ্রামের মহম্মদ আবদুল

আজীজ (১৮৬২-১৯০৫?), চেংগাড়ানিবাসী কবি আবদুল হামিদ কাব্য-বিনোদ (১৮৮০?-১৯৪৩), জুগীরগোফা গ্রামের উজিরউদ্দীন আহমদ, তেঁতুলবাড়িয়ার রেয়াজউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই চারজনই ছিলেন গাংনী থানার অধিবাসী এবং ইসলামের মহিমা-প্রচারই ছিলো এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। মেহেরপুরের দারিয়াপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী' (১ বৈশাখ ১৩১৯)। এ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে বৈশাখ—১৩২০ সালে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত হয় 'সাধক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। শেখ জমিরুদ্দীনের জন্মগ্রাম গাঁড়াডোবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নদীয়া সাহিত্যসভা'। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকেই ১৯২০ সালের ৩১মার্চ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে (১৮৬৯-১৯৫৩) 'সাহিত্যসাগর' উপাধি প্রদান করা হয়। মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে দীর্ঘজীবী 'পল্লীশ্রী'র নাম উল্লেখযোগ্য।

মেহেরপুর অঞ্চলে মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীই প্রধান। এরপরেই খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের স্থান। মেহেরপুরের নানাস্থানে প্রাচীন মন্দির ও মঠ আছে। বল্লভপুরের মন্দির, বাগোয়ানের মন্দির, আলমপুর ও শ্যামপুর গ্রামের মাঝখানে কাজলা নদীর পার্শ্ববর্তী ভগ্ন-জীর্ণ মন্দির, কাথুলীর শিবমন্দির একসময়ের হিন্দু-প্রাধান্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ আমলে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাতে সর্বাধিক মুসলমানের বাস ছিলো, মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে এরপরেই ছিলো মেহেরপুর মহকুমার স্থান।[১১] বরকন্দাজপাড়ার মসজিদ, পিরোজপুরের মসজিদ, মৃধাপাড়ার দরগা, যাদবপুর-বাড়েবাঁকা গ্রামের রাস্তার পাশে ঢেলাপীরের দরগা, রাজাপুরের মুসকিল আসানের দরগা, গোভী-সুবিদপুরের শাহ্ ভালাইয়ের দরগা, পিরোজপুরের শাহ্ এনায়েতের দরগা, বিবি বরকতের দরগা—এসব নিদর্শন দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলে মুসলিম-বসতির কথা প্রমাণ করে। এখানে অভিজাত মুসলমান-পরিবারেরও বাস ছিলো। মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুরের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি জানিয়েছেন, "মেহেরপুরের সৈয়দ ও খোন্দকার উচ্চবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।"[১২] 'নদীয়া-কাহিনী'তে (পৃঃ ১৭২) বলা হয়েছে মেহেরপুর, গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর, বাগোয়ান প্রভৃতি গ্রামে "বহুসংখ্যক 'শরীফ' বা ভদ্র মুসলমান বাস করেন।"

উনিশ শতকের প্রথম পাদে 'বলরামভজা' নামে নদীয়ার একটি বিশিষ্ট লৌকিক-ধর্মের উদ্ভবও হয় মেহেরপুরে। সাধক বলরাম হাড়ি (১৭৮৫-১৮৫০) প্রবর্তিত এ সম্প্রদায়ের আখড়া মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় ভৈরবনদের তীরে অবস্থিত। অন্ত্যজ নিম্নশ্রেণীর মানুষই এ জাতিভেদহীন ধর্মমতের অনুসারী। বলরামের শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলো বলে জানা যায়।

মেহেরপুর খ্রীস্টমণ্ডলীর একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বহু পূর্ব হতেই পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট উভয় শ্রেণীর মিশনারীদের চেষ্টায় মেহেরপুর অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ হতেই চার্চ, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম গড়ে ওঠে এবং প্রলুব্ধ-উপকৃত নিম্নশ্রেণীর অভাবী হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করে। মেহেরপুরের ভবেরপাড়ায় নদীয়া জেলার প্রথম চার্চ (মাটির গীর্জা) নির্মিত হয় ১৮৩৮ সালে।[১৩] এর কিছুকালের মধ্যেই বল্লভপুর ও রতনপুরে মিশনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৮৪১ সালে রতনপুর মিশনগৃহ ও গীর্জা নির্মিত হয়। ১৮৫০ সালে রেভারেণ্ড জে. জি. লিঙ্কের চেষ্টায় বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চের জন্ম হয়। রোমান ক্যাথলিকদের উদ্যোগে ১৮৬৬ সালে প্রথম গ্রাম-মিশন ('Village mission') প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুরের দারিয়াপুর গ্রামে।[১৪] উনিশ শতকের শেষ-প্রান্তে ভবেরপাড়ায় ক্যাথলিক চার্চ ও ১৮৮৩ সালে ভবেরপাড়ার নতুন প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ নির্মিত হয়। মেহেরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ. লিবাস তাওডিন খ্রীস্ট-মণ্ডলীর কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ১৯০৪ সালের এক রিপোর্টে তাঁর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাকে 'স্মরণীয় দান' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[১৫] মূলত মিশনারীদের প্রচার-কৌশল, সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবামূলক কাজের জন্যই এ অঞ্চলের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর একাংশ খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দারিদ্র্য আর অশিক্ষাই ছিলো এর প্রধান কারণ।

মেহেরপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলো দরিদ্র। ফসল-উৎপাদন কখনোই আশানুরূপ হতো না, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাও ছিলো সীমিত। আর তাছাড়া দরিদ্র রায়ত-প্রজার উপর নীলকর-জমিদারের শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারও অব্যাহত ছিলো। এর উপরে ছিলো উপর্যুপরি খরা-বন্যা-সাইক্লোন-দুর্ভিক্ষ মহামারীর আঘাত। এসব কারণে মেহেরপুরের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়।

নদীয়ায় ১৮৭১ সালে ভয়ঙ্কর বন্যা হয় এবং এ বন্যায় নদীয়া জেলার "Meherpur Subdivision were first to suffer."[১৬] নদীয়া জেলায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৮৬৬ ও ১৮৭৩-৭৪ সালে, ১৮৯৬-৯৭ সালে আবারও দুর্ভিক্ষ হয়, এর প্রভাব মেহেরপুরেও পড়ে। ১৯০৮ সালের দুর্ভিক্ষে নদীয়ার অন্যান্য অঞ্চলসহ মেহেরপুর মহকুমার সদর ও গাংনী থানাও আক্রান্ত হয়।[১৭] ১৮৬৪ সালে যুগপৎ খরা ও সাইক্লোনের আঘাতে মেহেরপুর অঞ্চল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরো জানা যায়:

> ১২৫৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মহামারীতে অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতশ্রী হইয়া পড়ে; পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্বের সে শ্রী আর ফিরিয়া আসে নাই।[১৮]

এ ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মেহেরপুর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কাজ নেই, অন্ন নেই, বাঁচার অবলম্বন নেই; —এ রকম পরিস্থিতির পুরো সুযোগ খ্রীস্টান মিশনারীরা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে মূলত বাঁচার তাগিদেই মেহেরপুর অঞ্চলের অনেক নিঃস্ব-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়, পারলৌকিক ত্রাণের চাইতে ইহলোকে অস্তিত্বরক্ষার গরজেই তারা পিতৃধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টের শরণ নেয়। সমকালীন সাক্ষ্যও মিলছে সেইরকম:

> নদীয়া জেলায় আজি বেরাদরগণ।
> যত কেরেস্তান লোগ কর দরশন।।
> বাপদাদা তাহাদের আকালের বারে।
> পেটের দায়েতে মজে যিশুর মন্তরে।।
> দেলজান হইতে তারা যিশু না ভজিল।
> আপসোসে আখের সবে পরাণ তেজিল।[১৯]

'আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলামে'র এক প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে:

> আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন, মেহেরপুর ও কৃষ্ণনগর সদর মহকুমার এলাকায় আট হাজারের অধিক খৃষ্টান অধিবাসীর বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান বংশোদ্ভব। তাহারা গত ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয় লয়। পাদরীরা

সেই সুযোগে তাহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। যদি মুসলমান-সমাজে অর্থ থাকিত বা শিক্ষিত হইয়া ইসলামের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিত, তাহা হইলে প্রাণ গেলেও পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয়ে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতনা।[২০]

উপরি-বর্ণিত আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় উনিশ শতকের সাতের দশকে মেহেরপুরের এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের আবির্ভাব।

জন্ম ও পরিবার-পরিচিতি

মেহেরপুর জেলা-সদর[২১] থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্বে গাংনী উপজেলার অন্তর্গত গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। 'নদীয়া-কাহিনী'তে মেহের-পুর মহকুমার উল্লেখযোগ্য স্থানের বিবরণে গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুরের নাম পাওয়া যায়।[২২] 'আখলাকে জমিরিয়া ও রদ্দে নাছারা' পুঁথিতে বলা হয়েছে,—

'গাঁও এক গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর।/
নদীয়া জেলার বিচে আছয়ে মশ্‌হুর॥'[২৩]

এই গ্রামের পরিচিতি দিতে গিয়ে জমিরুদ্দীন লিখেছেন:

পাঠান রাজত্বকালে হজরত বাহাদুর শাহ নামক জনৈক দরবেশ এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে বাহাদুরপুর। নদীয়া জেলায় আরও ২/৩ টি বাহাদুরপুর গ্রাম আছে, সেই সমস্ত গ্রাম হইতে পৃথক করিবার জন্য জমিদারেরা অত্র বাহাদুরপুরের পূর্ব্বে গাঁড়াডোব বসাইয়া দিয়াছেন। গাঁড়া, মানে ছোট, ডোব মানে ডোবা বা পুষ্করিণী। এইজন্যই বোধহয় গাঁড়াডোব শব্দ বাহাদুরপুরের পূর্ব্বে বসাইয়া থাকিবেন।[২৪]

উল্লিখিত গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর গ্রামে বাংলা ১২৭৭ সালের ১৫ মাঘ (১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ) সোমবার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মুন্‌শী শেখ জমি-রুদ্দীনের জন্ম। শেখ মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন ও লাফিরন বিবি তাঁর জনক-জননী। জমিরুদ্দীনের পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে শেখ মোহাম্মদ বাকের ও শেখ আনোয়ারুদ্দীন। শেখ আমিরুদ্দীনের সাত পুত্রের নাম

যথাক্রমে জান মোহাম্মদ, আবদুল শেখ, তারিফ শেখ, রণজিৎ শেখ, জমিরুদ্দীন, আলেক শেখ ও লাল মোহাম্মদ। পিতা আমিরুদ্দীন ছিলেন ধর্মপ্রাণ 'পরহেজগার মোছল্লি'। জমিরুদ্দীনের জীবনীকার জানাচ্ছেন:

বাবাজান তাঁর সেখ আমিরুদ্দী নাম।
ছিল অতি দিনদার পাক্কা মোছলমান ।।
সরা শরিয়ত কাম দস্তুর মতন।
করিতেন বার মাস ভেবে নিরাঞ্জন।।
নামাজ রোজাতে ভারি ছিল ওস্তয়ার।
নেকেতে ছিলেন রাজি বদেতে বেজার ।।
বেদাত বেসারা চাল দেখিলে নজরে।
নছিহত দিত লোকে হরেক প্রকারে।।[২৫]

জমিরুদ্দীন নিজে তাঁর পিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:

তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান এবং মুসলমানধর্ম্মের নিয়মানুসারে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেননা।[২৬]

ধর্মপ্রাণ পিতার কঠোর তত্ত্বাবধানে জমিরুদ্দীনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। পিতা আমিরুদ্দীন সম্পন্ন জোতদার ও পুস্তক-ব্যবসায়ী ছিলেন। জানা যায়, কলকাতার ৪৩৩ নং আপার চিৎপুর রোডে 'আমিরুদ্দীন লাইব্রেরী' নামে তিনি একটি পুস্তক-বিপণি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসা বেশীদিন চলে নি। মামলা-মোকর্দ্দমা ও শরিকানা বিবাদের কারণে তাঁর ব্যবসা ও জোতদারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে অবস্থারও অবনতি ঘটে। পিতামাতার প্রতি জমিরুদ্দীন খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এঁদের মৃত্যুতে শোকাভিভূত জমিরুদ্দীন দু'টি কবিতা রচনা করেন যা তাঁর 'শোকানল' পুস্তকে সংকলিত হয়। তাঁর 'আসল বাঙ্গালা গজল' পুস্তকটি জনক-জননীকে উৎসর্গ করেছিলেন।[২৭]

শিক্ষাজীবন

জমিরুদ্দীনের বিদ্যাশিক্ষার হাতেখড়ি গ্রামের পাঠশালার গুরু-মহাশয়ের নিকটে। এরপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন মক্তব ও স্কুলে পড়াশুনা করেন। জমিরুদ্দীন তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন:

আমার পিতা আমাকে মুসলমানধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী করণার্থে আমার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমাকে একটি মকৃতবখানায় ভর্ত্তি করিয়া দেন।

আমি মক্তবখানাতে কয়েক বৎসর অতি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পবিত্র মুসলমানধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, রোজা, নামাজ ইত্যাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাহার পর আমার পিতা বাংলাভাষা শিক্ষা করণার্থে আমাকে বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আমি বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করি। পরে আমার পিতা আমাকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার্থে কোন স্কুলে ['আমঝুপি খ্রীষ্টান স্কুল'] প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানে আমার বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে আমি কৃষ্ণনগরে গমন করি।[২৮]

জমিরুদ্দীন কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। এখানে লেখাপড়ার সময়ে তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন। এভাবে খ্রীস্টধর্মে তাঁর ক্রমশ বিশ্বাস জন্মায় এবং অবশেষে ১৮৮৭ সালে তিনি ধর্মান্তরিত হন। এরপর কিছুদিন তিনি চাপড়ার মাইনর স্কুলে পড়েছিলেন। এখান থেকে তিনি কলকাতার সি. এম. এস. হাইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন।[২৯] এখানে অল্পদিন পড়াশুনার পর ১৮৮৮ সালে গাঁড়াডোবের বাড়ীতে ফিরে আসেন। কিছুকাল বাড়ীতে থাকার পর ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরের মিশনারী নর্মাল স্কুলে পুনরায় ভর্তি হয়ে 'রীতিমত অধ্যয়ন' করে 'নর্মাল পাঠ্য' সমাপ্ত করেন। তখন এ স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন পাদ্রী এ.জে. স্যাণ্টার। ১৮৯০ সালে পাদ্রী স্যাণ্টার ইংল্যাণ্ডে চলে গেলে পাদ্রী ই.টি. বাটলার স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। লেখাপড়ার ব্যাপারে জমিরুদ্দীনের আগ্রহ ছিলো প্রবল। জানাচ্ছেন তিনি, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পর,—

...মিশনারী মহাশয়েরা আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, আমাকে মিসন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অতীব ইচ্ছুক হন, কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আমার আরও ইচ্ছা হওয়াতে তাহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই।[৩০]

রেভারেণ্ড জানি আলি ও রেভারেণ্ড বাটলার সাহেবের সহায়তায় জমিরুদ্দীন ১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদের সেণ্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করতে যান। এ কলেজে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। এখানে কয়েক বছর পড়াশুনার পর কলেজের শেষ পরীক্ষায় (B. T. H. বা Bachelor of Theology) কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম

বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯২ সালে H. G. R. (Higher Grade Reader) বা 'পাঠকরত্ন' উপাধি অর্জন করেন। এ পরীক্ষায় তিনি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। জমিরুদ্দীনের উপাধিপত্রটি নিম্নরূপ :[৩১]

C. W. Society
N. W. P. Conference

It is hereby certified that Shaikh Zomiruddin having passed the Examination for the higher grade of Theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this conference for that office.

Allahabad
Dated 15th May 1893.

A. Sterne, Chairman.
A. Hednight, Secretary.

এলাহাবাদ সেণ্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজের পঠন-পাঠন সম্পর্কে জমিরুদ্দীন যে-বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে তাঁর বিদ্যাচর্চার ইতিবৃত্তের পাশাপাশি মিশনারীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশেষ ধারণা পাওয়া যায় :

> ...১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, এলাহাবাদ সেণ্ট পলস ডিভিনিটি কলেজে থিয়লজী পড়িতে গমন করি।...ভারতে মোট মিসনারী সোসাইটির ৩টী ডিভিনিটি কলেজ আছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ ও লাহোর। এই তিনটী কলেজ হইতে খৃষ্টান ছাত্রগণ বিশেষতঃ হিন্দু ও মোসলমান কনভার্ট ছাত্রগণ (নূতন খ্রীষ্টান) হিন্দু, মোসলমান ও খৃষ্টানী ধর্ম্মে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতের নানা স্থানের মিশনে প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। কলিকাতার ডিভিনিটী কলেজে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় ছাত্রদিগকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। এলাহাবাদ ও লাহোর ডিভিনিটী কলেজে উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় ছাত্রদিগকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু ছাত্রদিগকে মূল আরবী, সংস্কৃত, হিন্দী ও গ্রীকভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এলাহাবাদ ডিভিনিটী কলেজে তিনটা শ্রেণী। ১ম শ্রেণী রিডার, ২য় শ্রেণী ক্যাটিক্ষিষ্ট ও ৩য় শ্রেণী ডিকা ও প্রিষ্টের জন্য নির্দ্ধারিত। এলাহাবাদের ডিভিনিটীতে আমি রিডার ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।...

...আমি এলাহাবাদের ডিভিনিটীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।... আমরা এক ক্লাসে বম্বে, ইরান, গোরক্ষপুর, বেনারস, ফয়জাবাদ, গাজিয়াবাদ, জব্বলপুর, মৃজাপুর, নেপাল, ভোটান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের ছাত্র অধ্যয়ন করিতাম। বঙ্গের একমাত্র ছাত্র কেবল আমি একাই ছিলাম। আমি বাঙ্গালী বলিয়া সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পরীক্ষায় আমি প্রত্যেকবারেই সর্বোচচ স্থান অধিকার করিতাম, ইহাতে তাহারা সকলেই আমার নিকট নত হইয়া থাকিত ও বাঙ্গালী জাতির প্রশংসা করিত। ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিত পাদৃ নহি মির নীলকণ্ঠ গোরে শাস্ত্রী আমাদিগের সহিত এক ছাত্রাবাসে বাস করিতেন ও বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতেন।[৩২]

তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিলো। মাঝে-মধ্যে এই বিশেষ সবকের পরীক্ষাও গৃহীত হতো। যেমন:

কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদিগকে বক্তৃতা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যহ শনিবারে হাটবাজারে লইয়া যাইয়া শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষা করিতেন; হিন্দুমোসলমানের নিকটে কেমন করিয়া প্রচার করিতে হইবে, তর্ক করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় অভ্যাস করাইবার জন্য সফরে লইয়া যাইতেন। তথায় আমাদিগকে তাম্বুতে বাস করিতে হইত।[৩৩]

এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে কে কী পড়াতেন সে-সম্পর্কে জমিরুদ্দীন তাঁর স্মৃতিচর্চায় উল্লেখ করেছেন:

[প্রিন্সিপ্যাল] পাদ্রী হ্যাকের্ট সাহেব আমাদিগকে ইব্রানি ভাষায় তৌরাত কেতাব পড়াইতেন। [ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল] পাদ্রী জনষ্টন সাহেব জব্বুর ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিতেন। পাদ্রী জন ব্যাপ্টিষ্ট উর্দ্দু ভাষায় মণ্ডলীর ইতিহাস (চার্চ্চ হিষ্ট্রি) মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তক (প্রেয়ার বুক ৩৯ প্রকারণ Thirty nine article of Church Mission), পাদ্রী মীর হাদী উর্দ্দু ও আরবী ভাষা পড়াইতেন এবং মোহাম্মদী তর্কশাস্ত্র (mohammaden controversy), পাদ্রী সরযূপ্রসাদ হিন্দি ও সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ (Hinduism) শিক্ষা দিতেন। ক্লাসে অনেকসময় অধ্যাপকদিগের সহিত নিম্নোক্ত ['আসল বাইবেল কোথায়?'] বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত।[৩৪]

এলাহাবাদের কলেজ-জীবনে তাঁর পড়াশুনার খরচ মিটতো কীভাবে সে-সম্পর্কে জমিরুদ্দীন বলেছেন :

> কলেজে রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হইল; সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ হইতে লাগিল। এলাহাবাদ গবর্ণর বাহাদুরের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ লেটুজ সাহেবের ভগ্নি মিস এল, ডি, লেটুজকে বাংলা ভাষা শিখাইবার জন্য আমাকে শিক্ষকতা করিতে হইত; ইহাতে মাসিক ৩০ু পাইতাম এবং ক্যাথিড্রাল মিশন বৃত্তি মাসিক ২৫ু পাওয়া যাইত। ইহা দ্বারা কোনরূপে আমার পড়াশুনার খরচ চলিয়া যাইত। ...যাহা হ'ক এইভাবে কলেজে আমার পাঠ্য-জীবন কাটিতে লাগিল।[৩৫]

এলাহাবাদের পর তিনি কলকাতার সি.এম.এস. ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজেও কিছুকাল লেখাপড়া করেন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সমাপ্তি। এসব প্রতিষ্ঠানে তিনি, "দীর্ঘকাল খৃষ্টধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন"।[৩৬]

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলেও আজীবন তিনি নানাসূত্রে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ ছিলো। তাঁর এই ব্যক্তিগত সংগ্রহ। শুধু প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের নয় একজন ভাষাবিদের বিরল সন্ধানও তাঁর প্রাপ্য। বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিলো। তাঁর ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান ছিলো উল্লেখ করার মতো। তিনি ইংরেজী থেকে অনেক রচনা বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধও রচনা করেছেন। স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণার কারণ ছাড়াও তাঁর কর্মজীবনের বিশেষ প্রকৃতির জন্যও তাঁকে নিয়মিত পড়াশুনা করতে হতো। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও তাতে ছেদ পড়ে নি।

বিবাহ ও সংসারজীবন

শেখ জমিরুদ্দীন দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। স্বগ্রাম গাঁড়াডোবের নিকটবর্তী খোকসা গ্রামে তিনি প্রথম বিবাহ করেন, তাঁর স্ত্রীর নাম শামসুন্নেসা। বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো নয় বছর। শামসুন্নেসার পিতার নাম

সংগ্রহ করতে পারি নি, তবে তাঁর এক ভাইয়ের নাম কিনু শেখ ছিলো বলে জানা যায়। ১৩০৮ সালের ৮ কার্তিক অল্প বয়সে শামসুন্নেসা পরলোকগমন করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা একটি শোক-কবিতা তাঁর 'শোকানল' (১৩১৬) কাব্যপুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। স্ত্রীকে স্মরণ করে লিখেছেন :

অকালে কোথায় গিয়ে করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।...
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন ;
তব সনে হয় মম বিবাহ-বন্ধন ;
সেই প্রেম-সম্মিলনে,
একসঙ্গে দুইজনে
সুখ-দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল।

জমিরুদ্দীন-সুহৃদ যশোরের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর (১৮৬১-১৯০৭) উদ্যোগে ১৯০২ সালে (আষাঢ় ১৩০৯) কুষ্টিয়ার অন্তর্গত দহকুলা গ্রামের হাজী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার (১৮৫০-১৯০৩) 'মধ্যমা' কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ-অনুষ্ঠানে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জমিরুদ্দীনের বর্ণনায় জানা যায় :

> ১৭ই আষাঢ় [১৩০৯] মঙ্গলবার মুন্‌শী [মেহেরুল্লাহ্] সাহেব কলিকাতায় গমন করেন। গ্রন্থকারের বিবাহ উপলক্ষে কলুটোলায় একটী ক্ষুদ্র সভা আহুত হয়। পরলোকগত হাজী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা, মুন্‌শী মনিরুদ্দীন আহমদ মরহুম, মুন্‌শী হাজী ফয়জুল্লা, মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। মুন্‌শী [মেহেরুল্লাহ্] সাহেব পাত্রীপক্ষীয়দিগের সহিত এমনভাবে তর্ক করিয়াছিলেন যে, ঐ পক্ষের সকল তার্কিককেই নীরব হইতে হইয়াছিল।[৩৭]

জমিরুদ্দীনের পুস্তক-ব্যবসায়ী শ্বশুর মুসলিম বিদ্বদসমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়:

> বিগত ২২শে আষাঢ় [১৩১০] মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময়, কলিকাতা—সিন্দুরিয়া পটীর সুবিখ্যাত মুসলমানী কেতাব বিক্রেতা, নদীয়া দহকুলানিবাসী হাজী মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব, ৫৭ বৎসর বয়সে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। গত বৎসর হাজী সাহেবের মধ্যমা কন্যার সহিত, ইসলাম-প্রচারক নদীয়া গাঁড়াডোবনিবাসী শ্রীযুক্ত শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের শুভবিবাহ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এক বৎসর গত হইতে না হইতেই শেখ সাহেবের শ্বশুর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। হাজী সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহার নাবালক পুত্র ও নাবালিকা কন্যা এবং শেখ সাহেব বড়ই মর্ম্মাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হাজী সাহেব অতি সরল, দয়ালু ও খাঁটী মুসলমান ছিলেন। তাঁহার দ্বারা অনেকগুলি মুসলমানী দোভাষী পুথি প্রকাশিত হইয়াছিল। হাজী সাহেব আমাদেরও পরম বন্ধু ছিলেন। দয়াময়ের নিকট তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করি।[৩৮]

শ্বশুরের মৃত্যুতে জমিরুদ্দীনের রচিত একটি কবিতা তাঁর 'শোকানল' কাব্য পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়।

দুই স্ত্রীর গর্ভে জমিরুদ্দীনের আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আজিজুদ্দীন ও নূরজাহান প্রথম স্ত্রীর গর্ভের সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তিনপুত্র তিনকন্যা—যথাক্রমে জামালুদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন, ঈমানুদ্দীন, গওহর-জান, মনিরজান ও কমরজান। জমিরুদ্দীনের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র গওহরজান (৮০) জীবিত আছেন।

জমিরুদ্দীনের পুত্রদের মধ্যে আজিজুদ্দীন, জামালুদ্দীন ও গিয়াসুদ্দীন তাঁর পুস্তক-প্রকাশনা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জমিরুদ্দীনের অনেকগুলো বইয়ের প্রকাশক হিসেবে তাঁর পুত্র-কন্যাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে। গাঁড়াডোবে প্রতিষ্ঠিত 'জমির লাইব্রেরী' তাঁর পুত্ররাই পরিচালনা করতেন। পুত্র জামালুদ্দীন ছিলেন ঐ অঞ্চলের খ্যাতনামা শৌখিন শিকারী। লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিলো। 'বিধবার দুঃখ' নামে তাঁর একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমার সংগ্রহে আছে। তবে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কন্যা বেগম নূরজাহান সরস্বতীর (১৮৯৮-১৯৮৩) নাম অধিক উল্লেখযোগ্য। নূরজাহান পিতার তত্ত্বাবধানে

লেখাপড়া শিখেছিলেন, গ্রামের জেনানা-মক্তবে শিক্ষকতা করতেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হতো। 'শরিয়ত' (আশ্বিন ১৩৩২) পত্রিকায় 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)' নামে তাঁর একটি দ্বাদশপংক্তির কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। 'উপদেশ-মুঞ্জরী' নামে নূরজাহান সরস্বতীর একটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থটির একটি বিজ্ঞাপন মুন্শী জমিরুদ্দীনের 'ইসলামী বক্তৃতা' (৩য় সং: ১৩২২) পুস্তিকায় শেষ-মলাটে মুদ্রিত হয়েছিল :

> "এই গ্রন্থে কোরাণ-হাদিস, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা এক অভিনব জিনিষ ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এমন উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

জমিরুদ্দীনের অধঃস্তন তৃতীয় পুরুষের, তাঁর পৌত্র-পৌত্রীদের, অবস্থা বর্তমানে অতি শোচনীয়;—প্রায় সকলেই ভীষণ দরিদ্র, প্রাথমিক স্তরের উর্ধ্বে লেখাপড়া শেখার সুযোগ কারোরই হয় নি। পেশাগত জীবনে তাঁদের কেউ কৃষক, কেউ রিক্সাচালক, চায়ের দোকানদার, আবার কেউবা ভবঘুরে-বেকার। দারিদ্র্য আর অশিক্ষার কারণে তাঁরা জমিরুদ্দীনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত—ধারাবাহিকতার পথও রুদ্ধ। জমিরুদ্দীনের স্মৃতি-সংরক্ষণের যোগ্যতা বা সঙ্গতি কোনোটাই তাঁদের নেই ।

ধর্মজীবন

জমিরুদ্দীন ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রথাগত বিশ্বাসের বিন্দুতে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি, সংশয় ও জিজ্ঞাসা এসে তাঁকে স্থানচ্যুত করেছে, ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন এসেছে বারবার। প্রথম জীবনে ধর্মনিষ্ঠ পিতার প্রেরণা ও আগ্রহে তিনি "মক্তবখানাতে কয়েক বৎসর অতি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পবিত্র মুসলমানধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, রোজা, নামাজ ইত্যাদি কার্য্য করিতে আরম্ভ"[৩৯] করেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন :

এছলামি আদবকায়দা হাল হকিকত।
রোজা ও নামাজ তার বেনা যে তাবত।।
শিখিয়া খোড়াই রোজে জেহেনের বলে।
নামোয়ার হন খুব পড়ুয়া মহলে।।[৪০]

মাসুম হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

অর্থাৎ

হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা।

জেলা নদীয়া—পোঃ গাঁড়াডোব নিবাসী
ইস্‌লাম-প্রচারক
শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ
কাব্যনিধি প্রণীত

ও

জেলা জলপাইগুড়ি—মালদহী প্রবাসী
মুন্‌শী আলিমুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্‌;
রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

মাসুম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গ্রন্থের প্রচ্ছদ



GOVERNMENT OF BENGAL

BY ORDER of His Excellency the Governor of Bengal this certificate is presented, as a mark of approbation, to *Maulvi Jamiruddin Vidyabinode* in recognition of his services in opposing the Civil Disobedience Movement in *Rajshahi* District in 1930.

Commissioner

Dated the *7th March*, 1931.

বাংলার গবর্নরের প্রশংসাপত্র

মেহের-চরিত

অর্থাৎ

যশোহর—ছাতিয়ানতলা নিবাসী, ইস্‌লাম-প্রচারক, বাগ্মী-কুলতিলক, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লা মরহুম সাহেবের জীবনী।

জেলা নদীয়া, পোঃ সাহারবাটী; গাঁড়াডোব নিবাসী
ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচারক
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রণীত

ও

নদীয়া—গাঁড়াডোব হইতে
শেখ আজিজুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্,
রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্তৃক মুদ্রিত।

—o—

সন ১৩১৪ সাল; পৌষ।

'মেহের-চরিত' গ্রন্থের আখ্যা-পত্র

আমঝুপি খ্রীস্টান স্কুলে পড়ার সময় জমিরুদ্দীন প্রথম বাইবেল পাঠ করেন এবং উক্ত স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র সরকারের সৌজন্যে 'হজরত মোহাম্মদের বয়ান', 'ফোরকান', 'ইঞ্জিল কেতাব', 'বেগোনাহ্ নবী', 'ইসা ও মোহাম্মদ' প্রভৃতি 'খ্রীষ্টানী পুস্তকে'র সঙ্গে পরিচিত হন। "...১৮৮৫ সালে খ্রীষ্টান প্রচারক কাজি আইনদ্দিন ও মুন্‌শী নছিরদ্দিন তাম্বুতে বাস করিয়া গাঁড়াডোব অঞ্চলে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদিগের প্রচার শুনিয়া ও পুস্তকাদি পড়িয়া ইস্‌লামে সন্দেহ ও খৃষ্টানধর্ম্মে বিশ্বাস হয়।"[৪১] এরপর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পড়তে গিয়ে খ্রীস্টান মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। জমিরুদ্দীন এ-সময়ের কথা তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেছেন:

> তাঁহারা [মিশনারী] আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, আবার আমিও তাঁহাদিগকে বড় ভক্তি করিতাম। পরে জনৈক মিসনারী আমাকে "বাইবেল" ও "ইসলামদর্শন" ইত্যাদি কতকগুলি খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক প্রদান করেন; আমি তাহা অতি যত্নপুর্ব্বক পাঠ করি। উক্ত পুস্তক যে আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতাম এমন নহে। যে যে স্থানে বুঝিতে না পারিতাম, সেই সেই স্থানে পেন্‌সিল দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিতাম এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে মিসনারীদিগের নিকট যাইয়া বুঝিয়া লইতাম। আমি যখন উক্ত পুস্তকগুলি তাঁহাদের নিকট বুঝিয়া লইতে যাইতাম তখন তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন ও অতি যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। যাহা হউক, উক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে করিতে আমার মনে মুসলমান ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। এই প্রকারে খ্রীষ্টধর্মে আমি আসক্ত হই।[৪২]

অতঃপর জমিরুদ্দীন খ্রীস্টধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলেছেন তিনি:

> ... মিসনারীদিগের নিকট যাইয়া বাপ্তাইজ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমার বাপ্তাইজের একটি দিন স্থির করিয়া দেন। ইতিমধ্যে আমার বাপ্তাইজ হইবার কথা আমার বাটীস্থ লোক জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত হন এবং আমাকে বাটীতে ফিরাইয়া লইবার জন্য আমার নিকট গমন করেন। আমার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি অনেকেই আমার নিকট আসিলেন

এবং আমাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আমার মন কিছুতেই তাহাদের কথায় প্রবোধ মানিলনা ; সুতরাং আমি আর বাটীতে ফিরিলামনা। ... স্নেহময়ী জননী কাঁদিতে লাগিলেন, প্রিয় পিতা ও প্রাণসম ভ্রাতা কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; অন্যেরা কত নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন ...। ...পরিশেষে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া রীতিমত খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খৃষ্টে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া প্রিয় আত্মীয়স্বজনের অবাধ্য হইয়া ও তাহাদের মনে অতীব কষ্ট দিয়া ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বরিবার অপরাহ্নে পাদ্রী সলিভান সাহেব কর্ত্তৃক বাপ্তাইজিত হইয়া, খ্রীষ্টসমাজভুক্ত হইলাম।[৪৩]

জমিরুদ্দীন নদীয়া জেলার চাপড়া গীর্জায় পাদ্রী সালিভান সাহেবের নিকটে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর বাপ্তাইজের সময় 'ইসলাম দর্শন' ও 'মিজানুল হক' পুস্তকের গ্রন্থকার পাদ্রী যাকোব কান্তিলাল বিশ্বাস ও পাদ্রী জি এইচ. পারসনস্ বাপ্তাইজ-প্রণালী বাংলায় পাঠ করেছিলেন। খেরাল তরফদার ধর্ম-পিতা আর মিসেস কে. ঘোষ ধর্মমাতা হয়েছিলেন। জমিরুদ্দীন দীর্ঘ আট বছর খ্রীস্টানসমাজভুক্ত ছিলেন।

জমিরুদ্দীনের পুনরায় মুসলিমসমাজে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীও চমকপ্রদ। এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজে 'ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে' পড়ার সময় জমিরুদ্দীন তাঁর 'পাঠ্য-লেকচার' থেকে 'আসল কোরাণ কোথায়?'—এই নামে একটি প্রবন্ধ ১৮৯২ সালের জুন মাসে 'খ্রীষ্টিয় বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রচলিত কোরআন শরীফের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে সাত দফা যুক্তি উপস্থাপন করেন। 'সুধাকর' পত্রিকায় (১৯ চৈত্র ১২৯৯) জমিরুদ্দীনের এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের দফাওয়ারী সুদীর্ঘ জবাব প্রদান করেন যশোরের ছাতিয়ানতলানিবাসী প্রখ্যাত ইসলাম-প্রচারক মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ 'ঈসাই বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' শিরোনামে। মেহেরুল্লাহর এই জবাবী-প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জমিরুদ্দীন 'সুধাকরে' (২৩ বৈশাখ ১৩০০) একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখেন। মেহেরুল্লাহ এর জবাবে 'সুধাকরে' (১৭ আষাঢ় ১৩০০) লেখেন 'সর্ব্বত্রই আসল কোরআন'। এরপর অবশ্য জমিরুদ্দীন এই বিষয়ে আর কোনো বাদ-প্রতিবাদে অংশ-গ্রহণ করেন নি। মেহেরুল্লাহ্‌র এই যুক্তিনিষ্ঠ জবাব জমিরুদ্দীনের মনে গভীর

দাগ কাটতে সক্ষম হয়। এইসময় থেকেই তাঁর অন্তর্জগতে ক্রমশঃ ভাবান্তরের আভাস দেখা দেয়।

মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে এই তর্ক-বিতর্কের বছরেই অর্থাৎ ১৮৯২ সালে কুষ্টিয়া অঞ্চলে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কালে তাঁর মনে বাইবেলের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। জমিরুদ্দীন জানাচ্ছেন:

একদিন আমি মধুগাড়ী নামক পল্লীতে তাম্বুর মধ্যে শয়ন করিয়া কোরান শরিফের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতেছি, এমন সময় সুরা সফের ৫ আয়েতে (৬১শ সুরা) উপস্থিত হইলাম। তথায় লেখা আছে যে, "ইসা বলিলেন,...আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাঁহার নাম আহম্মদ, আগমন করিবেন। উপরিউক্ত বাক্যটি পাঠ করিতে করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিল যে, উক্ত বাক্যটি পূর্বে বাইবেলে ছিল, কিন্তু দুষ্ট খ্রীষ্টানেরা উহা বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক বাইবেল যে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং...জানিতে পারিলাম যে, বর্ত্তমান সময়ে কোথায়ও আসল বাইবেল নাই, খ্রীষ্টানেরা উহা বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।[৪৪]

এভাবে জমিরুদ্দীনের মনে খ্রীস্টধর্মের প্রতি যে অচলা ভক্তি, শ্রদ্ধা, আস্থা ও বিশ্বাস জন্মেছিল তা টলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য-ধর্মের অন্বেষণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল ও কাতর হয়ে উঠলো। অন্তরে অন্তরে তিনি গভীর যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন, তাঁর মনোদ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠলো:

পাঠক! যে ধর্ম্মের জন্য আমি স্নেহের পিতা-মাতা, প্রাণসম ভ্রাতা-ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও সনাতন মুসলমানধর্ম্ম, এমন কি জগৎ পরিত্যাগ করিলাম, সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হইল ইহাতে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কি করি, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিনা; খৃষ্টানধর্ম্ম যে মিথ্যা হইবে ইহা পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া, বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলাম। এইসময়ে আমি যতই বাইবেল পাঠ করি ততই যেন বাইবেলের ভ্রষ্টতা দেখিতে পাই।[৪৫]

খ্রীস্টধর্মে জমিরুদ্দীনের ক্রমশঃ 'অবিশ্বাস' ও 'অনাস্থা' জাগলে তিনি 'যৎপরোনাস্তি দু:খিত ও অনুতপ্ত' হন। এই অবস্থায় তাঁর অন্তরের ধর্ম-জিজ্ঞাসা তাঁকে একসময় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। এ-সম্পর্কে বলেছেন তিনি :

> ...আমি যে সময়ে এলাহাবাদের 'মাদরাছা ইলম এলাহী''তে পড়িতাম সেইসময়ে বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ভায়াদিগের সহিত মিশিতাম। সময়ে সময়ে তাহাদের উপাসনাগৃহে যাইতাম ও তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতাম। তাহাতে ব্রাহ্মদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মমত আমার কতকাংশ জানা ছিল। এইসময়ে মনে মনে স্থির করিলাম যে, খৃষ্টসমাজে আর না থাকিয়া কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্মমত ভাল করিয়া অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইব। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সহিত মিশিলাম; কলিকাতায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের আদেশানুসারে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মমত ভাল লাগিল।[৩৬]

জমিরুদ্দীন ব্রাহ্মমতের প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হয়ে উঠছেন যখন, সেইসময়ের একটি ঘটনা তাঁর মানস-পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলকাতার এ্যালবার্ট হলে ব্রাহ্মসমাজের নগেন্দ্রনাথ মিত্র 'মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্ম' বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর আলোচনায় তিনি ইসলাম-ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে খ্রীস্টানসমাজের বিষোদ্‌গার ও অভিযোগ খণ্ডন করে তাঁকে ঈশ্বরে সমর্পিত একজন প্রকৃত মহামানব ও সত্যধর্ম প্রবর্তক বলে অভিহিত করেন। এই বক্তৃতা জমিরুদ্দীনের মনে সত্য-ধর্ম অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষাকে আরো প্রবল করে তুললো। তাঁর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন তিনি :

> উপরোক্ত বাক্যগুলি আমি শ্রবণ করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরে বিশেষ বিশেষ মুসলমানধর্ম্ম পণ্ডিতদিগের নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাদের নিকটে সত্য সনাতন দীন ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করি। তাহার পরে অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তিভাজন মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবকৃত "রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম" ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহ্মদ ও শেখ আবদর রহিম সাহেবকৃত

"ইসলামতত্ত্ব" ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করণান্তর পবিত্র মুসলমানধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।[৪৭]

এরপর জমিরুদ্দীন তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বিলম্ব বা দ্বিধা করেন নি:

আমি যখন খ্রীষ্টানধর্ম্ম মানিনা, তখন আর সমাজে থাকিবনা বলিয়া মিসনারী কার্য্য পরিত্যাগ ও নিজ বাড়ীতে আগমনপূর্ব্বক প্রিয় আত্মীয়-স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ-উল হক সাহেব কর্ত্তৃক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হই।[৪৮]

কিন্তু জমিরউদ্দীনের এই প্রত্যাবর্তনকে রক্ষণশীল মুসলমানসমাজ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁকে বেশ কিছুদিন 'একঘরে' হয়ে থাকতে হয়। পরে অবশ্য কয়েকজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় তিনি সমাজে গৃহীত হন। সমাজের এই অযৌক্তিক বৈরী মনোভাবের কারণে জমিরুউদ্দীনকে 'ঋণপাপে আবদ্ধ' এবং তাঁর অগ্রজকে 'সর্বস্বান্ত' হতে হয়। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র বিশেষ 'যত্ন,' 'চেষ্টা' ও 'সাহায্যে' তিনি ঋণমুক্ত হন।

মুসলমানসমাজে প্রত্যাবর্তনের পর মুন্‌শী জমিরুদ্দীন তাঁর গ্রামের স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের (১৮৬২-১৯৩৩) পরামর্শে তিনি মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও প্রধান সহচর হিসেবে অবশিষ্ট জীবন নিজের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সেবা করেন।

প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারকৌশলে, জমিরুদ্দীন যাকে বলে-ছেন 'মোহনমন্ত্র', আকৃষ্ট হয়ে তিনি খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্মের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতার সাক্ষাৎ পেলে হয়তো তাঁকে ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতো না:

...এইসময়ে যদি আমি "রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান" পুস্তক ও শ্রীযুক্ত মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব সদৃশ প্রচারক পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় খ্রীষ্টান হইতামনা।[৪৯]

প্রচারক-জীবন

জমিরুদ্দীনের সমগ্র কর্মজীবন জুড়ে আছে প্রচারক-জীবনের তৎপরতা। মুসলমানসমাজে পুন:প্রত্যাবর্তনের পর অল্প কিছুদিন স্কুল-শিক্ষকতা ছাড়া

পূর্বাপর তিনি প্রচারক হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রথম জীবনে খ্রীস্টধর্মের প্রচারক এবং পরবর্তীকালে ইসলামধর্মের প্রচারক হিসেবে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পড়াশুনার সময় ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে পাদ্রী বাটলার সাহেবের তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণনগরের কুতঘাটে প্রথম প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষানবিশী পর্যায়ে কুতঘাটে প্রদত্ত তাঁর প্রথম প্রচার-বক্তৃতায় বলেন:

> 'আমি একজন নূতন খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে মোসলমান ছিলাম। মোসলমানধর্ম্মে পাপের মুক্তি (নাজাৎ) না পাইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রভু যীশুর নামে অবগাহিত অর্থাৎ, বাপ্তাইজ হইয়াছি, আমি পূর্ব্বে পাঁচবার নামাজ পড়িতাম, রমজান মাসে রোজা রাখিতাম কিন্তু তাহাতে কোন উপকার পাই নাই। হজরত ইসা আলায়হেচ্ছালামকে খোদাতালা পাপীর পরিত্রাণ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনি পাপীর বন্ধু জগতের সমস্ত পাপীর জন্য প্রাণ দিয়া, সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মুক্তি পাইয়াছি। তোমরা সকলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, মুক্তি পাইবে।[৫০]

এরপর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের পাঠ-শেষে আনুষ্ঠানিক প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

> ...নর্ম্মাল পাঠ্য শেষ করিয়া, খ্রীস্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজ কৃষ্ণনগরে আমি প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিকের গ্রামসমূহে প্রচার করিয়া, শীতকালে পাদ্রি চার্লটন সাহেবের সহিত তাম্বুতে উত্তর নদিয়ায় প্রচারে যাই প্রথমে বিক্রমপুর, দেবগ্রাম, নিজলাঘাট, পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র, বরেয়া ও বাণিয়া প্রভৃতি গ্রামসমূহে খৃষ্টানী বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। পরে নদীয়া শীকারপুরে নূতন মিসন ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায় পাদ্রি সাহেবেরা আমাকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৫১]

এই শিকারপুর মিশনে তিনি পাদ্রী লেক্কিবার সাহেবের অধীনে আল্লার-দর্গা, হলুদবাড়িয়া, মীরপুর, সোনাইকুণ্ডি, ভেড়ামারা, মহিষাডেরা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। এরপর পাদ্রী শল সাহেবের সঙ্গী হিসেবে মুরুটীর মাধপুর,

বানিয়াডাঙ্গা, কাথুলি, আউদিয়া, জিগলকান্দী প্রভৃতি স্থানে প্রচারের কাজ করেন।

পরবর্তীতে এলাহাবাদ সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে পড়ার সময় আরো উন্নত প্রচার-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। জানিয়েছেন তিনি:

> কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদিগকে বক্তৃতা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যহ শনিবারে হাটবাজারে লইয়া যাইয়া শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা করিতেন; হিন্দুমোসলমানের নিকটে কেমন করিয়া প্রচার করিতে হইবে, তর্ক করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় অভ্যাস করাইবার জন্য সফরে লইয়া যাইতেন।[৫২]

এলাহাবাদের ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রচার-সফরে জমিরুদ্দীন বহু স্থানে গিয়েছেন।

এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে জমিরুদ্দীনকে সার্বক্ষণিক 'মিশনারী' বা প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এলাহাবাদেই তিনি মিশনের কাজ প্রথম আরম্ভ করেন। জমিরুদ্দীনের মেধা, প্রতিভা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকায় কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পাদ্রী এডওয়ার্ড বাটলার জমিরুদ্দীনকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি জমিরুদ্দীনের জন্য 'মিসনারী প্রচারকার্য্য স্কিম' তৈরী করে রেখেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তিনি তাঁকে উক্ত কাজে নিযুক্ত করবেন। পরীক্ষা-পাশের সংবাদ অবহিত হওয়ার পর বাটলার সাহেব তাঁকে কৃষ্ণনগরে ডেকে এনে নতুন মিশনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এই নতুন প্রচারক-জীবনের স্মৃতি প্রসঙ্গে জমিরুদ্দীন বলেছেন:

> শান্তিরাজপুর মিশন নদীয়া জেলার শিকারপুর নামক বিখ্যাত পল্লীর অতি দূরে অবস্থিত।...শান্তিরাজপুর মিশনের অধীনে আল্লারদর্গা, গুয়াবাড়ী ও তেঁতুলবাড়ীয়া প্রভৃতি মিশন ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছিল। কুষ্টিয়া মিশনও শান্তিরাজপুরের তখন অধীন ছিল। পাদ্‌রি লকেট সাহেব সকল মিশন ষ্টেশনের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। আমি মিঃ লেফিবার, মিঃ সাল, মিঃ ডন, পাদ্‌রি য্যাবিমেট, কাজী আইনুদ্দীন, আগষ্টিন মফিজদ্দীন, মুন্‌শী নছিরুদ্দীন, ডাক্তার পল প্রভৃতি কয়েকজন মিশনারী

প্রচারক পাদ্রি হ্যাকেট সাহেবের অধীনে থাকিয়া প্রচারকার্য্য করিতাম। সুফি মধু মিঞা মরহুম অত্র মিশন স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।[৫৩]

'জমিরুদ্দীন জানাচ্ছেন যে, "নদীয়া জেলায় মুসলমান মিশনারীর অতীব আবশ্যক" হওয়ায় তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি কুষ্টিয়ার অন্তর্গত "পদ্মানদীর তীরস্থ অনেকানেক পল্লীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার" করেন। তিনি "শীতকালে তাম্বুতে এবং বর্ষাকালে নৌকাতে থাকিয়া মফঃস্বলে প্রচার" করতেন।[৫৪]

জমিরুদ্দীনের প্রচার ও লেখনী বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। এর ফলাফল খ্রীস্টানসমাজকে লাভবান করেছিল। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য:

> ...এইসময়ে আমি মুসলমানধর্ম্মের বিরুদ্ধে তীব্র লিখনী ধারণ করিয়া অনেকানেক মুসলমান তনয়কে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করি। আর আমি যে কেবল লেখনী চালনা করিয়া অনেক লোককে খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি এমন নহে; প্রচার দ্বারাও অনেকানেক হিন্দুমুসলমানকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলাম।[৫৫]

ইসলামধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হওয়ার পর জমিরুদ্দীন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র একান্ত সহচর হিসেবে ইসলাম-প্রচারকের কাজ করেন। ১৯০৭ সালে মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর থেকে ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর এককভাবে ইসলাম-প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানত বিধর্মীদের ইসলামধর্মে আকৃষ্ট এবং স্বধর্মীদের ধর্মান্তর প্রতিরোধে খ্রীস্টান-মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২) বলেছেন:

> জনাব মুনশী সাহেবের নিকটেই শুনিয়াছি এই পুস্তক প্রকাশের [১৯৩৪] কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ১৩০৪২ জন খৃষ্টান ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে...।[৫৬]

প্রচারক হিসেবে জমিরুদ্দীনের অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় অন্যান্য সূত্রেও পাওয়া যায়। তাঁর বাগ্মিতা, যুক্তি উপস্থাপন-কৌশল, তার্কিক-প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, সরস বাক্‌ভঙ্গি সব মিলিয়ে তাঁর বক্তব্য সাধারণ শ্রোতাদের কাছে একটি বিশেষ আবেদনসৃষ্টিতে সক্ষম হতো। তাঁর প্রচারকজীবনের কথা নিজে কিছু লিখে রেখে গেছেন, অন্যের জবানীতেও তা জানা যায়।

জমিরুদ্দীনের সামাজিক জীবন ও প্রচারকজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পেছনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র অবদান সমধিক। তিনি জমিরুদ্দীনের মুসলমান-সমাজে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে যে পত্র (১৮ বৈশাখ ১৩০৪) লেখেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

> আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটী প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশ করুন, যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার বহন করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমরা দূরদারাজস্থ ধর্ম্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।[৫৭]

মেহেরুল্লাহ্‌র উপদেশ ও পরামর্শ অনুসরণ করে কালক্রমে জমিরুদ্দীন লেখক ও প্রচারক হিসেবে যথার্থই সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

মেহেরুল্লাহ্‌ জমিরুদ্দীনের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলিম-সমাজ সমীপে মেহেরুল্লাহ্‌ যে আবেদন প্রচার করেন, তাতে তিনি জমিরুদ্দীনকে 'উপযুক্ত প্রচারক' ও 'তেজস্বী বক্তা' হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর 'সুমধুর ওয়াজ' শুনে ইসলাম-প্রচারে তাঁকে 'উৎসাহিত' করার আহ্বান জানান।[৫৮] মেহেরুল্লাহ-প্রদত্ত একটি সভার বিবরণ ('মিহির ও সুধাকর': ১২ চৈত্র ১৩০৪) থেকে জানা যায় প্রচারক হিসেবে জমিরুদ্দীন কেমন ছিলেন, তাঁর প্রচার-বৈশিষ্ট্য, বাক্‌-ভঙ্গিমা, শ্রোতৃবর্গের প্রতিক্রিয়া, সর্বোপরি প্রচার-সাফল্য ছিলো কী অসাধারণ:

> বিগত ১৩ই ফাল্গুন [১৩০৪] বৃহস্পতিবারে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাগিট নামক স্থানে একটী বিরাট সভার অধিবেশন গিয়াছে। সভায় অনুমান তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য আমার সহিত মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সাহেব ও (চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মিসনারী নবদীক্ষিত মুসলমান) শ্রীযুক্ত

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন এইচ. জি. আর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া, রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ৭ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল।... তিনি [জমিরুদ্দীন] পার্টির সেই তিন সহস্র শ্রোতাপূর্ণ বিরাট সভায় দণ্ডায়মান হইয়া চারিঘণ্টাকাল "ইসলাম-ধর্ম্মের সত্যতা" সম্বন্ধে তেজস্বিনী ও সুললিত বঙ্গভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতাগণ এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, সেই তিন সহস্র লোকের মধ্যে প্রায় কেহই অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। ...আমি নিজে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছি ও অনেক বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্ম্মভাবে বিভোর হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই।[৫১]

নদীয়া জেলার রানাঘাটের প্রসিদ্ধ পাদ্রী মন্‌রো সাহেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য ১৩০৪ সালে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ তাঁর শিষ্য-অনুচরসহ সেখানে যান। মুন্‌শী জমিরুদ্দীন, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-সহ আরো অনেকে সেই দলে ছিলেন। পাদ্রী মন্‌রো সাহেব অবশ্য মেহেরুল্লাহ্‌র মুখোমুখি না হয়ে রণে ভঙ্গ দেন। শেষে রানাঘাটে বাহাসের পরিবর্তে এক সাধারণ ধর্মসভা (চৈত্র ১৩০৪) অনুষ্ঠিত হয়। কবি মোজাম্মেল হক 'সুধাকর' পত্রিকায় এই সভার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তাতে তিনি মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সম্পর্কে উল্লেখ করেন:

মুন্‌শী মেহেরউল্লা সাহেবের পরিচয় অনেকেই জানেন। এইজন্য কেবল মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। ইনি খ্রীষ্টানী কুহকে পড়িয়া ১৮৮৭ খৃঃঅব্দে বাপ্তাইজিত হন। কলিকাতা ও এলাহাবাদের সেণ্ট পাউল্‌স্‌ ডিভিনিটী কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া, শেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া—এইচ, জি. আর—অর্থাৎ পাঠকরত্ন উপাধি লাভ করিয়া মিশনারী প্রচারকের পদ গ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া, এবং প্রচার করিয়া অনেক হিন্দুমুসলমানকে খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু খোদার কি মর্জ্জী। তিনি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি ইস্‌লাম প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রথমতঃ মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব ইস্‌লাম সমাজের প্রথানুযায়ী হাম্‌দ ও নায়াতের বাদে ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ইঁহার তেজোপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী উচচ বক্তৃতা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রবণে বিবিধভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইনি অনর্গল তিন ঘন্টা বক্তৃতা করার পর, মুসলমানসমাজের প্রবীণ বক্তা মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন।[৬০]

মেহেরুল্লাহ্‌-জমিরুদ্দীনের ১৩০৫ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসের নোয়াখালী-সফর তাঁদের প্রচারক-জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নোয়াখালীর এই প্রচার-সফর সম্পর্কে একজন স্থানীয় কবি 'আখলাকে আহ্‌মদীয়া' নামে একটি কাব্য রচনা করেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেন:

মুন্‌শী মেহেরউল্লা নাম যশোরে মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে ত খোশনাম॥...
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার॥
সে দোন জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তেরশত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার॥
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি শহর বিচেতে॥
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলি ইস্কুলে।
শুনিয়া তামাম লোক আনন্দিত দেলে॥
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউনহলেতে।
সে দিনের বাত সবে শুন সকলেতে॥
জজ কালেক্টর আর যতেক হাকিম।
মুন্‌শী মৌলবী আর যতেক আলিম॥
বড় বড় হিন্দু আর যত খ্রীষ্টিয়ান।
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান॥
সে দোন জাহেদ মর্দ্দ হুশিয়ার হইয়া।
ওয়াজ করিল শুরু এলাহি ভাবিয়া॥
এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান।
হিন্দুমুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রাণ॥[৬১]

মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীনের যৌথ প্রচারকার্যের সাফল্যের বিবরণ দিতে গিয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনীকার জানিয়েছেন :

> কলিকাতার বিভিন্ন স্কোয়ারে বিশেষতঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়মিতভাবে প্রচার করা তখনকার পাদ্রীদের একটা প্রথা ছিল। এই স্থানকে মুসলমান-গণ চলিত কথায় গোলতালাব বলিয়া থাকেন। পাদ্রীদের এইরূপ কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া মুন্‌শী সাহেব মরহুম মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের সহিত কিছুদিন কলিকাতায় মুন্‌শী শেখ রেয়াজুদ্দীন সাহেবের বাটীয়া থাকিয়া উক্ত স্কোয়ারে পাদ্রীদের পাল্টায় বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে পাদ্রী-দের দুশ্চেষ্টা অনেকটা বিফল হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।[৬২]

মেহেরুল্লাহ্-জমিরুদ্দীনের মিলিত প্রচারের কিছু কিছু বিবরণ জমিরুদ্দীনের 'মেহের-চরিত', মোহাম্মদ আছিরদ্দীন প্রধানের 'মেহেরউল্লার জীবনী', শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' ও 'ইসলাম-প্রচারক'-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। আছিরদ্দীন প্রধান লিখেছেন :

> ১৩০৪ সাল হইতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত সেখ জমিরউদ্দীন সাহেবসহ তিনি [মেহেরুল্লাহ্] একত্রে পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, বরিশাল, নোওয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, নদীয়া, যশোহর, হুগ্‌লী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় সহর ও মফস্বলের ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।[৬৩]

এই তালিকায় আরো যুক্ত হবে ঢাকা, কলকাতা, হাওড়া, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের নাম।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর জমিরুদ্দীন এককভাবে দীর্ঘ ৩০ বছরকাল প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। এই পরবর্তী তিন দশকের ইতিহাসও যথেষ্ট বর্ণাঢ্য। তাঁর প্রচারকার্যের সাফল্যের সংবাদ প্রায়ই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হতো। 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকার (শ্রাবণ ১৩২৭) সূত্রে জানা যায়, আষাঢ় ১৩২৭ সালে 'আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা'র প্রচার-প্রচেষ্টায় যে ১৫জন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেন, এঁদের মধ্যে জমিরুদ্দীন একাই ১১ জনকে দীক্ষিত করেন। পরবর্তী মাসেও তিনি ৩ জন খ্রীস্টান যুবককে ইসলামধর্মে দীক্ষা দেন।[৬৪]

তাঁর শেষজীবনের একটি ধর্মসভার বিবরণ পুত্র জামালুদ্দীনের সূত্রে পাওয়া যায়:

> জেলা রংপুরের অন্তর্গত ভুরুঙ্গমারী মাইনর স্কুল প্রাঙ্গণে, ...বিগত ২৬শে বৈশাখ শনিবারে একটী বিরাট ধর্ম্মসভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় রাজকাছারীর সদর নায়েব, স্কুল ও পোষ্টমাষ্টার, ডাক্তার, বহু আমলা ও মোছলমান, হিন্দু সভায় যোগ দিয়াছিলেন। নদীয়া পোঃ গাঁড়াডোব-নিবাসী প্রবীণ বক্তা মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংবাদপত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।[৬৫]

জমিরুদ্দীনের প্রচার-তৎপরতা আমৃত্যু অব্যাহত ছিলো। মৃত্যুর মাত্র একবছর পূর্বের এক সংবাদে জানা যায়:

> জেলা নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুর নিকটস্থ খোকসা গ্রামে মৌলভী জমিরদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের নিকটে গত ২৫শে বৈশাখ [১৩৪৩ বাং] তারখে মার্থা নাম্নী জনৈকা খৃষ্টান মহিলা ইসলাম কবুল করিয়াছেন। উহার ইসলামী নাম ফাতেমা রাখা হইয়াছে। উক্ত খোকসার নাজিরদ্দিন মিঞার বাটীতে অবস্থান করিয়া উক্ত মহিলাটি জরুরী মসলামসায়েল শিক্ষা করিতেছেন।[৬৬]

জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহ্‌র সাফল্যের পরিধি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচার ও বাহাসের ফলে অনেক অমুসলমান ইসলামধর্ম গ্রহণ, 'সহস্র সহস্র লোক শেরেক বেদাত পরিত্যাগ' করে 'দীনদার' হন, বহু সুদখোর-মহাজন সুপথে ফিরে আসেন, বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় মাদ্রাসা-মক্তব-স্কুল, মুসলমানসমাজে কর্মোদ্যোগের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।[৬৭] মেহেরুল্লাহ্‌র এই অসাধারণ সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর আনিসুজ্জামান যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "এই গৌরবের অংশ জমিরুদ্দীনেরও প্রাপ্য।"[৬৮]

সাময়িকপত্র ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষকতা

সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জমিরুদ্দীন আমৃত্যু তাঁর ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র যথার্থ সমানধর্মা। জমিরুদ্দীন নিজে কোনো সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ বা সম্পাদনা না করলেও সমকালীন মুসলিম-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার

সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। নানাভাবে তিনি এসব পত্র-পত্রিকাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং কোনো কোনো পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্তও ছিলেন তিনি।

'ইসলাম-প্রচারক' (১২৯৮) পত্রিকার সঙ্গে লেখক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর গভীর যোগ ছিলো এবং তাঁর অধিকাংশ রচনাই এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার খবর জানা যায়।

রেয়াজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'সোলতান' (১৩১২) পত্রিকা প্রকাশে মুনশী জমিরুদ্দীনের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো। রেয়াজউদ্দীন এ-সম্পর্কে বলেছেন :

> সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে 'সোলতান' সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, রংপুর—মহীপুরের বিখ্যাত জমীদার খানবাহাদুর চৌধুরী আবদুল মজিদ মরহুম ও মৌলবী মির্জ্জা মোহম্মদ ইউছুপ আলী সব-রেজিষ্টার মরহুমের অর্থানুকূল্যে, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী মুনশী মোহম্মদ মেহেরুল্লা মরহুম, এসলাম-প্রচারক মুন্‌শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশেষ সাহায্যে বাহির হয়।[৬৯]

রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৮-১৯৪০) সম্পাদিত 'কোহিনুর' (১৩০৫) পত্রিকার সঙ্গেও জমিরুদ্দীন যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন 'কোহিনুর পরিচালক সমিতি'র অন্যতম 'সভ্য'।[৭০] এই সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্, আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই (১৮৪৫-১৯১০), ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন (১৮৫১-১৯২০?), দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮-১৯৩২), 'সাহিত্য' পত্রিকার অধ্যক্ষ যতীশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ। ১৩০৫ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'কোহিনুর' পত্রিকায় 'কোহিনুরের এজেণ্ট' হিসেবে মেহেরুল্লাহ্, কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), মোজাম্মেল হক প্রমুখের সঙ্গে মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের নামও ছাপা হয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছিল : "নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণকে 'কোহিনুরের' মাননীয় প্রতিনিধি ও হিতৈষী এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে।"

শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত মাসিক কবিতা-পত্রিকা 'লহরী'র (১৩০৭) 'পৃষ্ঠপোষক' মনোনীত হয়েছিলেন জমিরুদ্দীন। "লহরীর 'পৃষ্ঠপোষক' বন্ধু" শিরোনামে সম্পাদক লিখেছিলেন:

> আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লহরীর পৃষ্ঠপোষক হইয়া যথোচিত সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশাকরি, অন্যান্য মহাত্মাগণ ইঁহাদের দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া লহরীর স্থায়িত্ববিধান করিবেন।[৭১]

হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী (১৮৯৮-১৯৫৯) সম্পাদিত 'শরিয়ত' ও 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকার সঙ্গেও জমিরুদ্দীনের গভীর যোগ ছিলো। 'এস্লাম-প্রচারকে'র পর এই দুই পত্রিকাতেই জমিরুদ্দীনের অধিক সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সংখ্যা 'শরিয়তে-এসলামে' 'শরিয়ত-সুহৃদ' শিরোনামে জমিরুদ্দীনসহ দেশ-বিদেশের ৬৮ জনের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। এই তালিকায় ফুরফুরা শরীফের পীর মুহম্মদ আবুবকর (১৮৩৬-১৯৩৮), শর্ষিনার পীরসাহেব, মওলানা রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫), মওলানা মোয়েজুদ্দীন হামিদী প্রমুখের নাম ছাপা হয়েছিল। এই 'সুহৃদ'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছিল:

> "শরিয়তে এস্লাম" দ্বীন্দার মোসলমান মাত্রেরই প্রাণের জিনিষ; ইহার বহুল প্রচার তাঁহাদের অবশ্য কাম্য। বঙ্গ-ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু মোসলমান ভ্রাতা আল্লার ওয়াস্তে ইহার গ্রাহক সংগ্রহ ও উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। এস্থানে সেই সমস্ত সহৃদয় সুহৃদ্-বৃন্দের মাত্র কয়েকজনের নামধাম প্রকাশ করিয়া আমরা শোক্রি আদায় করিতেছি।

উপরি-উক্ত পত্র-পত্রিকা ছাড়া 'আঞ্জমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 'ইসলাম-দর্শন', 'বাসনা' 'হেদায়াত' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো।

সাময়িকপত্রের মতো সাহিত্যসেবীদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন জমিরুদ্দীন, প্রেরণা দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা' (১৩৩৪) গ্রন্থটি রচনার মূলে জমিরুদ্দীনের বিশেষ

ভূমিকা ছিলো। রেয়াজউদ্দীন এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন:

> ...মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ এণ্ড সন্স কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা।... আমি নদীয়া-গাঁড়াডোবনিবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা ও ইসলাম-প্রচারক মৌলবী শেখ জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী সাহেবের অনুরোধে, মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ মরহুমের সুযোগ্য ও পরম উৎসাহী মধ্যম পুত্র স্নেহাস্পদ আফতাবউদ্দীন আহমদ সাহেবের উৎসাহ, যত্ন, চেষ্টা ও ফরমায়েশ মতে আঁ হজরত (ছালঃ) এর জন্মকাল হইতে ওফাৎ (মৃত্যু) পর্য্যন্ত সকল ঘটনা যতদূর সম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়াছি।[৭২]

রেয়াজউদ্দীনের 'পাক পাঞ্জতন' (বৈশাখ ১৩৩৬) পুস্তক রচনার সঙ্গেও জমিরুদ্দীন যুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন:

> ...প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার হিতৈষী বন্ধু, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী সোদরপ্রতিম মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সহকর্ম্মী ও সহযোগী, বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তা নদীয়া—গাঁড়াডোবনিবাসী মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যা-বিনোদ ছাহেব,... বঙ্গে পুথি-সাহিত্যের একজন আদি প্রচারক... ঢাকা—গড়পাড়ানিবাসী মনিরুদ্দীন আহমদ মরহুমের সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র স্নেহাস্পদ আফতাবুদ্দীন আহমদ "সাহিত্যরত্ন" ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার দ্বারা "পাক পাঞ্জতনে"র পবিত্র জীবন-চরিত লিখাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।[৭৩]

দিনাজপুরের নীতপুরনিবাসী দেওয়ান শমসুউদ্দীন আহমদ পত্নী-বিয়োগে 'শোক-প্রবাহ' (১৩১৭) নামে যে কাব্যপুস্তিকা রচনা করেন তা প্রকাশের পরামর্শ ও প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন 'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক রেয়াজউদ্দীন আহমদ ও মুনশী জমিরুদ্দীনের নিকট থেকে। শমসউদ্দীন পুস্তিকার 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন:

> বিগত ১৩১৬ সালের ২রা চৈত্র বঙ্গবিখ্যাত বক্তা মাননীয় শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ইসলাম প্রচারক সাহেব ... মামুদপুরে বক্তৃতা প্রদানকল্পে শুভাগমন করেন। সেইসময় এই কবিতার কিয়দংশ পাঠ করতঃ, তিনিও গ্রন্থাকারে প্রকাশার্থে উপদেশ প্রদান করেন। প্রোক্ত মহোদয়দ্বয়ের উপদেশে ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করিলাম।

মনস্বী জসিমউদ্দীনের হস্তলিপি

ময়মনসিংহের গফরগাঁও নিবাসী শেখ আবদুল জব্বারের (১৮৮১-১৯১৮) 'বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস' (১৩১৭) গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে জমিরুদ্দীন এই তরুণ লেখককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জমিরুদ্দীনের বিশেষ স্নেহভাজন মেহেরপুরের গাংনী থানার চেংগাড়া গ্রামের কবি আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, প্রমুখেরা তাঁর নিকট থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন।

জমিরুদ্দীন গ্রন্থ-প্রকাশনার মাধ্যমেও এ-বিষয়ে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন মুন্শী মেহেরুল্লাহ্‌র বইয়ের উৎসাহী প্রকাশক। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু যশোরের খড়কীর পীর সাহেব মোহাম্মদ আবদুল করিমের (?—১৯১৫) 'এরশাদে খালেকিয়া' বইটির তৃতীয় সংস্করণের স্বত্ব তাঁকে প্রদান করা হয় এবং প্রকাশক হিসেবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়।[৭৪] জমিরুদ্দীনের প্রেরণাতেই তাঁর কন্যা নূরজাহান সরস্বতীর 'উপদেশ-মুঞ্জরী' বইটি লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাঁর ঘরোয়া চালচিত্র, চরিত্রের নানাদিক—এ-সব বিষয়ে খুব অল্পই জানা যায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মকথায়ও এর আভাস মেলে নি। তাঁর সমসাময়িকদের রচনাতেও তিনি অনুপস্থিত বলে এ-বিষয়ে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

প্রথম সাক্ষাতের (ফাল্গুন ১৩০৪) পরিপ্রেক্ষিতে মুন্শী মেহেরুলাহ্ জমিরদ্দীনের চেহারা আর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন: "শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব নব যুবক, সুন্দর ও সুপুরুষ ব্যক্তি" এবং "তিনি মিষ্টভাষী, তেজস্বী, বক্তা, চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক"।[৭৫] সংক্ষিপ্ততম হলেও, মেহেরুল্লাহ্‌র এই মন্তব্য, জমিরুদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যথার্থ নির্দেশক।

জ্ঞানস্পৃহা ও পাঠ-প্রবণতা ছিলো জমিরুদ্দীনের চরিত্রের একটি প্রধান দিক। ছিলেন জিজ্ঞাসু--অনুসন্ধিৎসু, ব্যাপক ছিলো তাঁর পড়াশুনার পরিধি। ফলে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিচিত্র-বিষয়ের গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছিল। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংগ্রহের জন্য উচচ মূল্য দিতেও কার্পণ্য করেন নি, কাঙ্ক্ষিত বইটি বিদেশ থেকে আনানোর উদ্যোগ নিতেও বিলম্ব করেন নি। জানিয়েছেন তিনি: "সম্প্রতি বিলাতের অক্সফোর্ড নগরী হইতে আসল বার্ণবার ইঞ্জিল

আমি আনয়ন করিয়াছি। উহার মূল্য প্রায় ১৬ শিলিং অর্থাৎ ১৫ পনের টাকা।"[১০] পাদ্রী ওয়েঙ্গার ও পাদ্রী রাউস্ সাহেবের অতি দুষ্প্রাপ্য সটীক বাইবেল সংগ্রহের জন্য তিনি 'খ্রীষ্টিয় বান্ধব' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দশ টাকার বই চল্লিশ টাকায় ক্রয় করেন। 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির' অধিবেশনে যোগ দিতে ১৩১৪ সালে জমিরুদ্দীন করাচী যান। পরে অমৃতসরে বেড়াতে গিয়ে খ্রীস্টান ট্রাক্ট সোসাইটি, আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করেন।[১১]

কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। সববিষয় সম্পর্কেই জানার একটা আগ্রহ তিনি সবসময়ই পোষণ করতেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলো পড়লে দেখা যাবে সেই অঞ্চলের মানুষ-প্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাকীর্তি, সাধক-মণীষী সবকিছুর সঙ্গেই তিনি পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতেন। চট্টগ্রাম-ভ্রমণকালে তিনি শাহ্ বদর ও শাহ আমানের মাজার শরীফ জেয়ারত করেন এবং এই দুইজন বুজর্গ সাধকের পরিচিতি-সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে আক্ষেপ করে বলেন: "দুঃখের বিষয়, স্থানীয় লোকদিগের নিকটে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত দুইজন মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলামনা।"[১৮] প্রসিদ্ধ স্থান বা প্রাচীন পুরাকীর্তি সম্পর্কে তাঁর নিরন্তর আগ্রহ ছিলো। চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে হিন্দুতীর্থ সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরে স্থাপিত শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির দর্শনেও কুণ্ঠিত হন নি।

জমিরুদ্দীনের সহমর্মিতা ও কর্তব্যবোধ ছিলো প্রবল। তিনি ছিলেন মেহেরুল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ পার্ষদ। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ বরাবর অক্ষুণ্ন ছিলো। তাঁর অন্তিম-মুহূর্তেও জমিরুদ্দীন কর্তব্য ভোলেন নি, তাঁর সুচিকিৎসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই চেষ্টা সফল হয় নি। মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পুত্রদের শিক্ষা ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আবেগঘন ভাষায় মুসলমানসমাজের প্রতি আবেদন জানান। আমৃত্যু তিনি মেহেরুল্লাহ্-পরিবারের প্রতি তাঁর যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করেছেন। এই ধরনের দুর্লভ নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যচেতনার পরিচয় জমিরুদ্দীন বরাবর দিয়ে এসেছেন।

সৌজন্য, বিনয়, সত্যপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতার শিক্ষা তাঁর জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। পরধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিতর্ক-বিবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

প্রতিপক্ষের যুক্তিখণ্ডন করতে গিয়ে রুচিবিকৃতি, স্থূল আক্রমণ বা অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেন নি। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "মিথ্যা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয় না এবং এই পথ অবলম্বন সর্ব্বদা গর্হিত।"[৭৯] তাঁর চরিত্রে আত্মবিশ্বাস ও জিদের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। যা করণীয় বলে মনে করেছেন তা সম্পন্ন করতে দ্বিধা করেন নি—কোনো বিরোধিতাই মানেন নি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ১৩২৫ সালে তাঁর উদ্যোগে গাঁড়াডোবে মেহেরপুর-অঞ্চলের প্রথম গো-কোরবানী হয়। এতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ বাধা আসে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়। কিন্তু জমিরুদ্দীন ঝুঁকি নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে মেহেরপুরের হাজী দীল মোহাম্মদ ওরফে দীলু ডাক্তার (১৮৯০-১৯৮৩) যে-ছড়া বেঁধেছিলেন তা আজও গ্রামাঞ্চলে শোনা যায়:

ছি ছি জ্বলে মোলাম প্রাণে তো আর সয়না
মুন্‌শীজীর এমন ঠেলা গোঁসাইরা আর গাঁড়াডোবে রয়না।
মেহেরপুরের মাড়োয়াবাদী তারা সব না হয় রাজি
জালিরাম এসে ধরে মুন্‌শীজীর পা চেপে
লক্ষ টাকা দেবো তোমায় শ্বেতপাথরের মসজিদ করেন
আর ছাগল কিনে কোরবানী দেন।...[৮০]

তবে নিজের ধর্মীয় আচার-বিধি পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তিনি বিনষ্ট হতে দেন নি। প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সদ্ভাব ছিলো। 'নদীয়া-সাহিত্য-সভা'র সভাপতি যদুনাথ গোস্বামী তত্ত্বনিধি ও গাঁড়াডোব গ্রামের ডাক্তার মন্মথনাথ সান্যালের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিলো। তাঁর সামাজিক সৌজন্যে প্রতিবেশী ভিন্নধর্মীরাও মুগ্ধ ও তুষ্ট ছিলেন।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ও সরল যোগাযোগ ছিলো। গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। তাঁদের সমস্যা বা অসুবিধা দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের দুঃখ-কষ্ট মোচনে বা প্রতিকারে কখনো খবরের কাগজে চিঠিপত্র বা সংবাদ প্রকাশ করেছেন, প্রশাসক বা রাজপুরুষের গোচরীভূত করেছেন। গ্রাম্য কলহ-বিবাদের সালিশ-মীমাংসাও কখনো কখনো করে দিতেন। তাঁদের দরখাস্ত রচনা বা মামলা-মোকর্দমার তদ্বিরও তাঁকে

অনেক সময় করতে হতো। পল্লী-বন্ধু এই মানুষটি অবসর সময়ে শৌখিন কবি-রাজী চিকিৎসা করতেন, গরীব প্রতিবেশী-গ্রামবাসী অনেক সময়ই বিনামূল্যে তাঁর নিকট থেকে চিকিৎসালাভ করতেন।

নিয়মিত ডাইরী লেখার অভ্যাস ছিলো তাঁর। অন্যকে লেখা চিঠিপত্রের নকল রাখতেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা রচনার কাটিং খাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে রাখতেন। রুটিনমাফিক সব কাজ করতেন। গুরুতর অসুস্থতা ব্যতীত কোনোদিন সভা-সমিতিতে অনুপস্থিত থাকেন নি।

তেমন আর্থিক সচ্ছলতা ছিলো না তাঁর। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছেদে সবসময়ই কেতাদুরস্ত থাকতেন; শেরোয়ানী-পাজামা, চোগা-চাপকান-পাগড়ী এই ছিলো তাঁর পোশাক। বই-পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ-ব্যয়ে কখনো কার্পণ্য করতেন না। অতিথি-সৎকারে ছিলেন দরাজ-দিল। প্রায় প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসতেন, সাধ্যমতো সকলকেই আদর-আপ্যায়ন করতেন—আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি রাখতেন না।

গুণগ্রাহিতা জমিরুদ্দীনের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিলো। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই তাঁর স্বগ্রামের 'নদীয়া সাহিত্য-সভা'র পক্ষ থেকে ১৯২০ সালের ৩১ মার্চ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে 'সাহিত্যসাগর' উপাধি প্রদান করা হয়। এই উপাধি-প্রদানের সংবাদ জমিরুদ্দীন চিঠি লিখে সাহিত্যবিশারদকে জানিয়েছিলেন। সাহিত্যবিশারদ তাঁর 'স্মারকলিপি' নামীয় বাঁধানো ডাইরীতে এ-সম্পর্কে লিখে রেখেছিলেন:

> নদীয়া গাড়াডোবনিবাসী শেখ জমিরউদ্দিনের সাহায্যে সাহিত্যসাগর উপাধিলাভ। ২৪.৪.২০ ইং[৮১]

শেখ হবিবর রহমানও জমিরুদ্দীনের উদ্যোগেই 'নদীয়া সাহিত্য-সভা' থেকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেন।

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

নিজের ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের সেবায় আজীবন নিয়োজিত থাকলেও জীবিতাবস্থায় বা মরণোত্তরকালেও যোগ্য কোনো সম্মান বা স্বীকৃতি তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো স্বীকৃতি-সম্মান তিনি লাভ করেন নি। এমন কি স্থানীয়ভাবে

মেহেরপুর, গাংনী বা গাঁড়াডোবে কোনো সড়ক বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণও তাঁর নামানুসারে হয় নি। ধর্মীয় বা সামাজিক ব্যক্তিত্ব কিংবা লেখক হিসেবেও তাঁকে স্মরণ করা হয় নি, চেষ্টা হয় নি তাঁর মূল্যায়নের।[৮২]

এই উৎসর্গীকৃত কর্মীপুরুষ তাঁর জীবদ্দশায় যে-টুকু স্বীকৃতি বা সম্মান অর্জন করেছেন তা তাঁর অবদান ও সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। জমিরুদ্দীন এলাহাবাদ সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজ থেকে শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে 'Higher Grade Reader' বা 'পাঠকরত্ন' উপাধি লাভ করেন। তিনি গাঁড়াডোবের 'নদীয়া সাহিত্য-সভা' থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'কাব্যনিধি' উপাধি পান। ফুরফুরা শরীফের পীর মুহম্মদ আবুবকর তাঁকে ১৩৩২ সালের ২ শ্রাবণ 'পাদ্রী মওলানা' ('রেভারেন্ড মওলানা') উপাধি প্রদান করেন। ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও 'রাজসেবা'র পুরস্কার হিসেবে ১৪ জানুয়ারী ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৯৩০ সালে রাজশাহী জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করায় বাংলার গভর্নর তাঁকে বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন (৭ মার্চ ১৯৩১)।

কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী' (১৩১৭) গ্রন্থে লেখক হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্থানলাভ করেছে। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখাল-রাজ রায় সম্পাদিত ১৩২২ সালের 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (১১ পৌষ ১৩২৩) জমিরুদ্দীনের নাম ও গ্রন্থতালিকা সংকলিত হয়েছে।

শেষজীবন ও মৃত্যু

শেষজীবনে জমিরুদ্দীন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর ২/৩ বছর পূর্বে ওয়াজ-মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার সময় হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামের ডাক্তার মন্মথনাথ সান্যাল ও পরে মেহেরপুরের ডাক্তার নরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র এম.বি. তাঁর চিকিৎসা করেন। অবশিষ্ট জীবনে এই অসুস্থ ও অপটু শরীর নিয়েও তিনি সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনের শেষ ৬ বছর তিনি বিপত্নীক জীবনযাপন করেন। ১৯৩৭ সালের ২ জুন (আষাঢ় ১৩৪৪) বুধবার বেলা ১-৩০ মিনিটে জমিরুদ্দীন গাঁড়াডোবে নিজ বাড়ীতে ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[৮৩] পরদিন সকাল ১০টায় তাঁকে গাঁড়াডোবে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন

করা হয়। তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে জানাজা পাঠ করেন মেহেরপুরের মৌলবী আবদুল হাকিম। তাঁর মৃত্যুতে কোথাও কোনো শোকসভা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর মৃত্যু-সংবাদ কলাও করে প্রকাশিত হয় নি।

একমাত্র 'শরিয়তে-এসলাম' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১৪১) পত্রিকায় জমিরুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ গুরুত্ব-সহকারে পরিবেশন করে। উক্ত সংবাদ-প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

> নদীয়া, গাঁড়াডোবনিবাসী প্রসিদ্ধ এসলাম মিশনরী মওলবী জমিরদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেব বিবিধ জটিল রোগাক্রান্ত হইয়া বিগত ২রা জুন বুধবারে এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন)। মরহুম বিদ্যাবিনোদ সাহেব তাঁহার দীর্ঘজীবনব্যাপী এসলাম ও মোসলমানের অক্লান্ত খেদমত করিয়া যশস্বী ও একান্ত ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া আট বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টান মিশনরী কলেজে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ হেতু ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। আট বৎসরকাল নামজাদা খৃষ্টান মিশনরী থাকিবার পর তিনি উহার অসারতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এসলাম গ্রহণ করিয়া পূর্ণোদ্যমে খৃষ্টধর্ম্মের অসারতা ব্যক্ত করিতে থাকেন। যশোহরের ছাতিয়ানতালা নিবাসী বঙ্গগৌরব মরহুম মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের নিকট এই মৌঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব তর্কে পরাস্ত হইয়া এসলামে দীক্ষিত হয়েন। মরহুম বিদ্যাবিনোদ সাহেবের অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশে শত শত খৃষ্টান, হিন্দু এসলাম কবুল করিয়া ধন্য হইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীকুল বিদ্যাবিনোদ সাহেবের নিকট ধর্ম্মতর্কে চিরদিন নির্ব্বাক হইয়া থাকিত।
>
> মরহুম বিদ্যাবিনোদ সাহেব ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া খৃষ্টানধর্ম্মের অসারতা ও এসলামের সত্যতা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।
>
> মরহুমের আকেবৎ খায়েরের জন্য দয়াময় আল্লাহতালার নিকট দোয়া করিতেছি।
>
> অতীব দুঃখের বিষয়, মরহুম জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের পরিবারবর্গ নানা কারণে আজ নিরাশ্রয় ও সহায়হীন। তাঁহাদিগকে সাহায্য

করিবার জন্য সমাজের নিকট অনুরোধ করিতেছি। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা : মো: আজিজুদ্দিন ৫৮ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জমিরুদ্দীনের মৃত্যুতে তাঁর প্রিয় সহচর ও অনুরাগী মেহেরপুরের গাংনী থানার চেংগাড়ানিবাসী কবি আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন ('শরিয়তে-এসলাম' : আশ্বিন ১৩৪৪) :

বক্তাকুল চূড়ামণি বঙ্গভূমে হে মুন্‌শী জমিরুদ্দীন
রেখে গেলে কীৰ্ত্তিগাথা গাঁড়াডোবে প্রাণ মৃত্যুহীন।

লেখক-জীবন ও গ্রন্থ-পরিচিতি

মুন্শী জমিরুদ্দীন বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় সাহিত্যচর্চা করেন নি, বিশেষ উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তিনি লেখনী ধারণ করেন। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য অন্বেষণ ও প্রচারই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে ভিন্নধর্মী বিরুদ্ধপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। মূলত ধর্মপ্রচার ও সেই সূত্রে খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বাদানুবাদই তাঁকে লেখক হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সঙ্গত কারণেই এসব রচনার বিশেষ কোনো সাহিত্যমূল্য নেই, আছে কেবল প্রচারমূল্য। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় প্রয়োজনে, সমাজহিতের কারণে তাঁকে আমৃত্যু অক্লান্তভাবে লেখনী-চালনা করতে হয়েছে।

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ বা রচনার সঠিক সংখ্যার হদিশ আজকের দিনে পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাঁর ক্ষুদ্রায়তন প্রচার-পুস্তিকাগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য, যে-সব পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখতেন তা-ও আজ আর সুলভ নয়। কেউ কেউ জানিয়েছেন, "...তিনি খৃষ্টানধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত ১০৮ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।"[৮৪] তবে এই সংখ্যার কথা অতি-রঞ্জিত বলেই মনে হয়। ফুরফুরা শরীফের পীর মুহম্মদ আবুবকরের এক বিবৃতি থেকে জানা যায়, খ্রীস্টান মিশনারীরা হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কুৎসা-প্রচার ও চরিত্র-হননের জন্য ৫২ খানা পুস্তক রচনা করেন। পীর-সাহেব উক্ত ৫২ খানা পুস্তকের পাল্টা প্রতিবাদ-পুস্তক রচনার নির্দেশ দেন জমিরুদ্দীনকে। 'রদ্দে খ্রীষ্টান' বা 'রদ্দে নাছারা' সিরিজের সূত্রপাত হয় এখান থেকেই।[৮৫] জমিরুদ্দীন জানিয়েছেন: "...পীর সাহেব কেবলার দৃঢ় আদেশে ঐ ৫২ খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতেছি...।"[৮৬] এই ৫২ খানা পুস্তকই যে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। জমিরুদ্দীন লেখক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি পুস্তিকারই একাধিক সংস্করণ এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

জমিরুদ্দীনের রচনার এক উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রীস্টান-মিশনারীদের বক্তব্য ও কার্যক্রমের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ফসল। ধর্মকেন্দ্রিক বাদানুবাদে

জমিরুদ্দীনের জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তি-উপস্থাপনের কৌশল ও প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডনের নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। খ্রীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার প্রতিরোধকল্পে তিনি তাঁর সর্বশক্তি ও অখণ্ড মনোযোগ নিয়োগ করেন। মুসলমানসমাজের প্রতি ফুরফুরার পীরসাহেবের একটি 'অনুরোধপত্রে' জানা যায়, এ-বিষয়ে জমিরুদ্দীনই ছিলেন সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বলেছেন: "ইসলাম প্রচারক পাদৃ মওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যা-বিনোদ সাহেব ব্যতীত এমন কোন লোক নাই যে, পাদ্রির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন।"[৮৭] জমিরুদ্দীন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁর ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুধু খ্রীস্টান মিশনারীই নয় হিন্দু প্রচারকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচ্চার;—এ-বিষয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তাঁর 'স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত', 'আর্য্যভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা' প্রভৃতি রচনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

জমিরুদ্দীন তাঁর গ্রন্থ-প্রকাশে মুসলমানসমাজের নিকট থেকে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেন। এ-প্রসঙ্গে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ ও ফুরফুরার পীর মুহম্মদ আবুবকরের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এঁরা দু'জনেই মুসলমানসমাজের প্রতি জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ-প্রকাশে উদারভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার আহবান জানান। তাতে যথেষ্ট সাড়াও পাওয়া যায়। এমন কি সুদুর দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া থেকেও সেখ জওহর আলী মিয়া (গ্রাম—হারাট, ডাকঘর—বন্দিপুর, জেলা—হুগলী) নামে একজন প্রবাসী বাঙালী ইসলাম-প্রচারক 'রদ্দে খ্রীষ্টান' সিরিজের বই প্রকাশের জন্য সাহায্য প্রেরণ করেন। ৬ পাউণ্ডের চেকের সঙ্গে জমিরুদ্দীনকে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ যে-চিঠি লেখেন তার অংশবিশেষ মূল বানান রক্ষা করে এখানে উদ্ধৃত হলো:

মোকর্রম

জনাব শাহ্ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ ইসলামপ্রচারক সাহেব হজরত আচ্ছালাম আলায়কোম আপনার ৪২৮ নং পত্র পাইয়া সকল অবগত হইলাম ও পাঠ করিয়া বহুতি দুঃখিত হইলাম। যাহা হজরত মওলানা শাহ ছুফি মহাম্মদ আবুবকর সাহেবের অনুমতিক্রমে কাগজ পাইলাম তাহা

পাঠ করিয়া যাহা রোমান ক্যাথলিকেরা ইসলামদর্শন ও মহাম্মদের বয়ান প্রভৃতি ৫২ খানা ইসলামবিদ্বেশপূর্ণ কদর্য্য পুস্তক প্রচার করিয়াছে আপনী তাহার খণ্ডনের জন্য পৃষ্টপোশক হইয়া ডাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া বহুতি সুকি হইলাম কিন্তু আপনার মত নিসার্থের ধর্ম্মপ্রচারক বড়ই বিরল। আপনী সেই ৫২খানা পুস্তক প্রপীড়িত মসলেম বঙ্গের খণ্ডোনের ব্রতি হইয়াছেন জে খোদা এই মহাপ্রাণে আপনার হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন সেই খোদারই তারিফ সেইজন্য আপনাকে হৃদয়ের আলীঙ্গন জানাইতেছি এবং আমি ও দেশের ৫ মুসলমান ভাই মিলিয়া যতসামান্য ৬ ছয় পাউন টাকা চেক করিয়া পাঠাইলাম পাইলে সংবাদদানে সুকি করিবেন এবং সাদরে গ্রহণ করিবেন।[৮৮]

জমিরুদ্দীনের রচনাবলিকে বিষয়ভিত্তিতে এইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব: ক. ধর্মতত্ত্ব ও বিতর্কমূলক রচনা ; খ. অনুবাদকর্ম ; গ সামাজিক প্রবন্ধ ; ঘ. জীবনী ; ঙ. আত্মজীবনীমূলক রচনা ; চ. ভ্রমণকাহিনী ; ছ. সৃষ্টিধর্মী রচনা ; জ. বিবিধ রচনা। অবশ্য এই শ্রেণীকরণের পুনর্বিন্যাসও সম্ভব। যেমন অনুবাদমূলক রচনাকে অনায়াসেই ধর্মতত্ত্ব ও বিতর্কমূলক রচনা-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জীবনী বা আত্মজীবনীমূলক যে রচনা তার প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গও ধর্মভিত্তিক এবং ভ্রমণের প্রেরণার মূলেও আছে ধর্মীয় প্রয়োজন। এমন কি তার সৃষ্টিধর্মী রচনাও ধর্মীয় উদ্দেশ্য-শাসিত। এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের সমগ্র রচনাই ধর্মাশ্রিত—ধর্মীয় প্রেরণার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব সর্বত্রই উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত।[৮৯]

ক. ধর্মতত্ত্ব ও বিতর্কমূলক রচনা : 'হজরত ইসা কে ?,' ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদের মন্তব্য', 'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশখবরী', 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর 'ধোঁকাভঞ্জন', 'মাসুম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা', 'আসল বাইবেল কোথায় ?', 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য', 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য', 'রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খ্রীষ্টান', 'পাদ্রি মনুরো সাহেবের ধোঁকা-ভঞ্জন', 'আসল হুলিযানামা'—এই পুস্তকগুলো এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বেশকিছু প্রবন্ধ এই শ্রেণীতে পড়ে। জমিরুদ্দীনের চিন্তা-

চেতনা ও কার্যক্রমের সবচেয়ে সার্থক পরিচয় নিহিত আছে এই পর্যায়ের রচনাবলিতে।

খ. অনুবাদকর্মঃ 'ইসলামী বক্তৃতা' এই পর্যায়ের বিশিষ্ট পুস্তিকা। অবশ্য 'হজরত ইসা কে?', 'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশখবরী' প্রভৃতি পুস্তিকাও অনুবাদশ্রেণীতে পড়ে। এ-ছাড়া পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু অনুবাদ-প্রবন্ধ পরে কোনো কোনো পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত পুস্তিকার কোনো কোনোটি ইংরেজী থেকে অনূদিত এবং কোনোটি বা উর্দু থেকে ভাষান্তরিত।

গ. সামাজিক প্রবন্ধঃ সমাজ-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ জমিরুদ্দীন রচনা করলেও তা কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকায় সংকলিত হয় নি, পত্র-পত্রিকার পাতাতেই আছে। এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'মুসলমানসমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' ও 'তামাকের অপকারিতা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. জীবনীঃ 'মেহের-চরিত', 'হজরত মোহাম্মদের জীবনী' গ্রন্থ এই পর্যায়ে পড়ে। পত্র-পত্রিকায় বেশ কয়েকজন দেশী-বিদেশী ব্যক্তিত্বের জীবনকথা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আছে 'হজরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ', 'মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী', 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী', 'হজরত মওলানা লুৎফল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ', 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ,' 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' [সিরাজগঞ্জী]।

ঙ. আত্মজীবনীমূলক রচনাঃ 'আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত' 'Glory of Islam' (এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'From Christianity to Islam'), এবং পত্রিকায় প্রকাশিত 'খ্রীষ্টিয় সমাজে আট বৎসর' নামীয় স্মৃতিচর্চামূলক প্রবন্ধ তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা।

চ. ভ্রমণকাহিনীঃ জমিরুদ্দীনের ভ্রমণবৃত্তান্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থভুক্ত হয় নি। এগুলো হলো, 'মুর্শিদাবাদ ভ্রমণবৃত্তান্ত,' 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ', 'পশ্চিম ভ্রমণ', 'দার্জ্জিলিং ভ্রমণ', 'মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ'।

ছ. সৃষ্টিধর্মী রচনা ঃ জমিরুদ্দীনের সৃষ্টিধর্মী রচনার সংখ্যা খুবই কম। কবিতা ও গজল ব্যতীত তাঁর সৃষ্টিধর্মী গদ্যরচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে আছে 'কোথা চলি গেলে!', 'আসল বাঙ্গালা গজল' ও 'শোকানল'। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার মধ্যে 'নিশীথে' ও 'পূর্ণচন্দ্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে।

জ. বিবিধ রচনা ঃ তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে 'পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ', 'বিশুদ্ধ খতনামা', 'নামাজ পড়া-শিক্ষা' প্রভৃতি পুস্তকের নাম করা যেতে পারে।

গ্রন্থ-পরিচিতি

১. **পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ**। প্রকাশক: শেখ জমিরুদ্দীন, ৪ গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১২ মে ১৮৯৭। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ১২। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের মন্তব্য, Grammar for instruction in parts of speech.[২০]

২. **আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত**। প্রকাশক: মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক: শেখ আবদুল জব্বার, অন্নপূর্ণা প্রেস, যশোহর। প্রকাশকাল: ১৩০৪। মূল্য: এক আনা। পৃষ্ঠা: ২৪।

তৃতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৩১৪। প্রকাশক: মোঃ উমরুদ্দীন চৌধুরী, শিমোর, দিনাজপুর। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, রেয়াজ-উল ইস্‌লাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: দেড় আনা।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র পরামর্শ ও উৎসাহে এই বইটি তিনি রচনা করেন। 'বাসনা' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) 'আমার জীবনী'র সমালোচনায় বলা হয়: "আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বল বিধানের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।" জমিরুদ্দীনের আত্মজীবনীমূলক এই পুস্তকটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ১৯১৩ সালের মধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩. **হজরত ইসা কে?**। প্রথম প্রকাশ: ১৩০৬। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩১৪। প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: ছয় পয়সা। পৃষ্ঠা: ৩১। উৎসর্গ: "স্বজাতি-বৎসল, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সুবক্তা, উন্নতমনা, বিবিধ/সদগুণরত্ন বিমণ্ডিত সোদরপ্রতিম পরম সুহৃদ/শ্রীল শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা/সাহেব করকমলেষু।"

চতুর্থ সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৩৩। প্রকাশক : শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক : নরেন্দ্রকুমার শীল, ৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য : দুই আনা। পৃষ্ঠা : ৩৬। উৎসর্গ : "স্বজাতি-বৎসল, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, উন্নতমনা, বিবিধ/সদ্‌গুণ-রত্ন বিমণ্ডিত জনাব/ হাজী মোহাম্মদ আবদুল আজীজ জমিদার ভাবতা — /মুর্শিদাবাদ সাহেব কর-কমলেষু।"

জমিরুদ্দীন প্রখ্যাত ইউনিটেরিয়ান মিশনারী আকবর মসীহ কর্ত্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত 'উসুহতে মসীহ' নামক পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তকটি রচনা করেন। 'ইসলাম-প্রচারক', (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯) পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় এই পুস্তক সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় : "এই পুস্তকের কিয়দংশ 'প্রভু যীশুখৃষ্ট কে?' শীর্ষক প্রবন্ধাকারে ইতিপূর্ব্বে 'ইসলাম-প্রচারকে' বাহির হইয়াছিল। ... মোটের উপর বলিতে পারি যে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট যে অদ্বিতীয় খোদাতাআলা বা তাঁহার পুত্র নহেন, গ্রন্থকার বাইবেল হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এ বিষয় উত্তম-রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন।"[৩১] 'বাসনা' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) মন্তব্য করা হয় : "এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে বোধহয় অনেক ভ্রান্ত খ্রীষ্টান ও অনেক অজ্ঞ মুসলমানের চোখ ফুটিবে। ধর্ম্মজীবনে সাফল্যলাভ প্রয়াসী প্রত্যেক খৃষ্টানের যেমন ইহা অবশ্য পাঠ্য, আত্ম-রক্ষার জন্য তেমনই ইহা সকল মুসলমানের নিত্য আদরে পঠিতব্য।"

মাসিক 'লহরী' প্রত্রিকায় (পৌষ ১৩০৭) 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় বলা হয় : "হজরত ঈসা কে? অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, না মনুষ্য? এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় মীমাংসা। শ্রী শেখ জমিরদ্দীন প্রণীত। গ্রন্থকার বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক। তিনি এই পুস্তকে হজরত ঈসা যে ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট মনুষ্য, ইহা গভীর গবেষণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রান্ত ঈসায়ীগণের সুমতি হইলেই মঙ্গল।" 'লহরী' পত্রিকায় (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে 'হজরত ঈসা কে' সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, "খৃষ্টান পরাস্ত করিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক"---এই বলে।[৩২]

৪. **ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদের মন্তব্য**। প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩০৭। মূল্য: ছয় পয়সা। পৃষ্ঠা: ১১।

দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩১৫। প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা ৫০। 'উৎসর্গ: "স্বগুণ-কীর্ত্তি মুকুট বিভূষিত, ইসলাম ধর্ম্ম-পরায়ণ, স্বজাতি বৎসল,/ দাতাগ্রগণ্য, উন্নতমনা, তেজস্বী. অমায়িক, নিরহঙ্কার, কার্য্য/ প্রিয়, ধাম্মিকপ্রবর, বিবিধ সদ্‌গুণ-রত্ন বিমণ্ডিত, পরম/শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাজন খুলনা—ধামালিয়ানিবাসী—/শ্রীল শ্রীযুক্ত মুন্‌শী আবদুল আহাদ তালুকদার সাহেব/স্বপবিত্র কর-কমলেষু।" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে, প্রকাশক ছিলেন নূরজাহান খাতুন।

চতুর্থ সংস্করণ: ১৩২২। প্রকাশক: বিবি নূরজাহান সরস্বতী, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: চার আনা। উৎসর্গ: "স্বগুণ কীর্ত্তিমুকুট বিভূষিত, ইসলামধর্ম্ম-পরায়ণ, স্বজাতি-বৎসল,/দাতাগ্রগণ্য, উন্নতমনা তেজস্বী অমায়িক নিরহঙ্কার,/কার্য্যপ্রিয়, ধার্ম্মিকপ্রবর, বিবিধ সদ্‌গুণ-রত্ন/বিমণ্ডিত, পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন/ খুলনা—ধামালিয়ানিবাসী—/জনাব মুনশী আবদুল আহাদ তালুকদার সাহেব।"

পঞ্চম সংস্করণ: ১ শ্রাবণ ১৩৩৩। প্রকাশক: বিবি নূরজাহান সরস্বতী ও বিবি আছিয়া খাতুন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মূল্য: পাঁচ আনা। পৃষ্ঠা: ৬০। উৎসর্গ: "স্বগুণকীর্ত্তিমুকুট বিভূষিত ইসলামধর্ম্ম পরায়ণ, স্বজাতি-বৎসল/দাতাগ্রগণ্য, উন্নতমনা, অমায়িক, নিরহঙ্কার,/ কার্য্যপ্রিয়, ধাম্মিক-প্রবর, বিবিধ সদ্‌গুণ রত্ন/বিমণ্ডিত, পরম ভক্তিভাজন/ নদীয়া চাঁপাতলানিবাসী/মুন্‌শী মোহাম্মদ ফজলে করিম ওরফে—মো: ফুলবাস সাহেব।"

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদের মন্তব্য' পুস্তকটি পাঠক-সামাজে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। এই বই সম্পর্কে 'বাসনা' পত্রিকা

(আষাঢ় ১৩১৬) মন্তব্য করেছিল: "ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন, 'ইউনিটি ও মিনিষ্টার' সম্পাদক ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিতবর গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীমৎ ধর্ম্মানন্দ ভারতী, 'ভূ-প্রদক্ষিণ' রচয়িতা চন্দ্রশেখর সেন, দার্শনিক টমাস কার্লাইল ও 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত T. W. Arnold নামক লেখকের সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত ইসলামধর্ম্মের সত্যতা প্রকাশক কতিপয় মন্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে।" মাসিক 'নবনূর' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১১) এই পুস্তকের প্রশংসা করে বলা হয়: "প্রত্যেক ইস্লাম-ভক্তেরই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত। পরধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিতে পারিলে এতৎ গ্রন্থ-সঙ্কলনের উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

৫. **কোথা চলি গেলে।।** প্রকাশক: গ্রন্থকার, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩০৮ (৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০২)। মূল্য: ছয় পাই। পৃষ্ঠা ৯। গ্রন্থস্বত্ব: গ্রন্থকার। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দু'টি কবিতা সংকলিত হয়েছিল: যথাক্রমে 'সহধর্ম্মিনী বিবি শামসুন্নেছা সাহেবার অকালমৃত্যু উপলক্ষে রচিত, ও 'মাতৃহীন বালকের বিলাপ'।

৬. **বিশুদ্ধ খতনামা।** প্রকাশক: মোহাম্মদ সোলেমান, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মুদ্রক: মোহাম্মদ সোলেমান, সোলেমানী মেশিন প্রেস, ১৫৫ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৩১০। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ১৪। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জমিরুদ্দীন বলেন: "বঙ্গভাষায় মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠসংক্রান্ত কোন পুস্তক না থাকায়, ঢাকা—ঘোনানিবাসী আমার প্রিয় দোস্ত জোনাব মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ ও নদীয়া—দহকুলনিবাসী মদীয় শ্বশুর জোনাব মুনশী হাজী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবদ্বয় আমাকে খতনামা লিখতে অনুরোধ করেন; আমি উক্ত সাহেবদ্বয়ের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া জনসমাজে "খতনামা" প্রচার করিলাম। যদি ইহার দ্বারা বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।"

পঞ্চম সংস্করণ: ১৩১৮। প্রকাশক: মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মুদ্রক: চুনীলাল ভট্টাচার্য, ১৪১ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩৬। পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন: "খতনামার ভাগ্যে যে পঞ্চম সংস্করণ হইবে ইহা স্বপ্নের অতীত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সুবিশাল বঙ্গদেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের কথা। যাহা হউক অনেকের অনুরোধে এবার ইহার কোন কোন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা গেল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা হইবে।"

দশম সংস্করণ: ১৩৩৬। প্রকাশক: মোহাম্মদ সোলেমান, আফ্তাবুদ্দীন আহমদ ও কমরুদ্দীন আহমদ, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মুদ্রক: মোহাম্মদ সোলেমান, সোলেমানী মেশিন প্রেস, ১৫৫ মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩৬। 'বাসনা' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) এই 'খতনামা' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: "পাড়াগাঁয়ের মুসলমান ছেলেরা কিম্বা যে সকল বালক অর্থাভাবনিবন্ধন গ্রাম্য পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য এই পুস্তক উপকারী হইবে।"

৭. **জঙ্গে কারবালা।** প্রকাশক: মোহাম্মদ সোলেমান, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মুদ্রক: মোহাম্মদ সোলেমান, সোলেমানী মেশিন প্রেস, ১৫৫ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ২ জানুয়ারী ১৯০৪। মূল্য: ?। পৃষ্ঠা: ২৮। মুদ্রণ-সংখ্যা: ২০০০। এই পুস্তকটিতে "কারবালার যুদ্ধকাহিনী" বিবৃত হয়েছে।[২৩]

৮. **বগুড়া জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুষ্ঠানপত্র।** বগুড়া জাতীয় মুসলমান সমিতির নিয়মাবলী। মুদ্রক: শেখ জমিরুদ্দীন, রায় প্রেস, বগুড়া। প্রকাশকাল: ৬ জুন ১৯০৫। মূল্য ?। পৃষ্ঠা: ৮।
মুদ্রণ-সংখ্যা: ১০০০।[২৪]

৯. **ইসলামী বক্তৃতা।** প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯

কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১৪। মূল্য: তিন আনা। পৃষ্ঠা: ৫৪। উৎসর্গ: সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদক, গাঁড়াডোব, নদীয়া। আষাঢ় ১৩১৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সোলেমান।

তৃতীয় সংস্করণ: ১৩২২। প্রকাশক: শেখ মোঃ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: চার আনা। পৃষ্ঠা: ৫৮+২। উৎসর্গ: "পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন—/অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/খানবাহাদুর সাহেব জোনাবেষু।"

চতুর্থ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৩২। প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন কাব্য-বিনোদ, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: নরেন্দ্রকুমার শীল, শীল প্রেস, ৩৩৩ আপার চিৎপুর রোট, কলিকাতা। মূল্য: পাচ আনা। পৃষ্ঠা: ৬০। উৎসর্গ: "পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন—/অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/খানবাহাদুর সাহেব জোনাবেষু।"

'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকটি 'Christianity and Islam' নামক ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। এই পুস্তকে ক্যানন আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস, কার্লাইল ও জন আবদুল্লাহ্‌র মতো কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধর্মবিদের প্রবন্ধ ও বক্তব্যের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ স্থান পেয়েছে। মাসিক 'শরিয়ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৩২) 'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকের (৪র্থসং) একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়: "মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনুবাদিত।... বিশপ পোজ্জী "সদ্ধর্ম্ম নিরূপণে", পাদ্‌রি রাউস "মোহাম্মদের বয়ানে", পাদ্‌রি যাকুব "ইসলাম দর্শনে" হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার উপরে যে সমস্ত মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক সম্বন্ধে মিষ্টার টেলর, মিষ্টার লিটনার, মিষ্টার টমাস, পাদ্‌রি জন ও মিষ্টার কার্লাইল যে সমস্ত বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

মাসিক 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩২) এই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়: "পবিত্র ইসলামের শিক্ষা, নীতি, আদর্শ, উদারতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে টেলার, টমাস, লিটনার ও কার্লাইল প্রমুখ কতিপয় প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান পাদ্রী ও পণ্ডিতের অভিমত এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠে প্রচারক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন। ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ—খ্রীষ্টান সভ্যতাভক্ত যুবকগণের পক্ষে এই পুস্তিকাখানি একবার পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।" 'বাসনা' পত্রিকাতেও (আষাঢ় ১৩১৬) 'ইসলামী বক্তৃতা'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

১০. **মেহের-চরিত**। প্রকাশক: শেখ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: পৌষ ১৩১৫। মূল্য: সাড়ে আট আনা। পৃষ্ঠা: ২+১৪৮+।৶.। উৎসর্গ: "স্বনাম-প্রসিদ্ধ, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সমাজ-হিতৈষী ও সুলেখক/পরম ভক্তিভাজন—/জনাব মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ/সাহেব ভক্তিভাজনেষু।"

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে 'মেহের-চরিত'ই শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য। এই জীবনী-গ্রন্থের সাহায্য ও অনুসরণেই পরবর্তীকালে মোহাম্মদ আছিরুদ্দীন প্রধান 'মেহেরউল্লার জীবনী' (১৯০৯) ও শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন 'কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্' (১৯৩৪) রচনা করেন। 'বাসনা' পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩১৫) 'মেহের-চরিত' সম্পর্কে বলা হয়: "যিনি গুণে সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে কিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায় বাঙ্গলাদেশের মুসলমানেরা জাতীয় উন্নতির জন্য অভ্যুত্থান করিয়াছেন, সেই কর্মবীর ধর্মাত্মা মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেবের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কি আছে? শেখ সাহেব পরলোকগত মহাত্মার জীবনী-কীর্ত্তন করিয়াছেন; যোগ্য হস্তে যোগ্য কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

১১. **আসল বাঙ্গালা গজল**। প্রকাশক : শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। প্রকাশকাল : ১৩১৫। মূল্য : এক আনা। পৃষ্ঠা : ১৯। নবম সংস্করণ : কলিকাতা, ১৩২০। নবম সংস্করণে একুশটি গজল সংকলিত হয় (জমিরুদ্দীন-১২, মেহেরুল্লাহ্-২, মীর মশাররফ হোসেন-১, মোজাম্মেল হক [ভোলা]-১, দেওয়া শমসুউদ্দীন-১, সলিমউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়া-১, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-১, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—১)।

চতুর্দশ সংস্করণ : পৌষ ১৩৩৭। প্রকাশক : শাহ্ মোহাম্মদ জামালুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক : মোহাম্মদ সোলেমান, সোলেমানী ইলেকট্রীক মেশিন প্রেস, ১৫৫ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য : দুই আনা। পৃষ্ঠা : ৩৬। উৎসর্গ : "আমার পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় পিতা / সুফি শেখ মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন / মরহুম মগ্‌ফুর কেবলা গাহ্ সাহেবের / ও / স্বর্গীয় আম্মাজান-সাহেবার / পবিত্র আত্মার মঙ্গল উদ্দেশ্যে / বাঙ্গালা গজল উৎসর্গ / করা গেল / ইতি।" গজল-সংখ্যা : তেরো।

'আসল বাঙ্গালা গজল' প্রকাশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জমিরুদ্দীন এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করেন : "১৩০৭ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখে, কুষ্টিয়ার নিকটস্থ ছেউড়িয়ার সভায় সুবিখ্যাত লেখক জনাব মীর মশাররফ হোসেন মরহুম সাহেব তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন। মীর সাহেবের নিকটে বাঙ্গালা গজল শুনিয়া বাঙ্গালা গজল লিখিতে আমার ও বাগ্মীবর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা মরহুমের ইচ্ছা হয়। পরে ঐ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পোড়াদহের নিকটে নফরকান্দি গ্রামে, চিন্তা বিবির বাটীর সভায় প্রথম আমরা উভয়ে মিলিয়া গজল লিখি। লোকের মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা সভাতে উহা পাঠ করিয়া থাকি। পরে উহার প্রতি লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখাতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। সাধারণে ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।"

'আসল বাঙ্গালা গজল' অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নবম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করা হয়েছিল : "তিনচারি বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।"

চতুর্দশ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়: "...কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রায় লক্ষাদি [লক্ষাধিক] পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।...সাধারণের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বর্দ্ধিত করা যাইবে।... এই গজল সম্বন্ধীয় অনেক জাল পুস্তক বাহির হইয়াছে, আসল দেখিয়া না লইলে ঠকিবেন।"

১২. **হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী।** দ্বিতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৩১৬। প্রকাশক: শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: অর্দ্ধ আনা। পৃষ্ঠা: ৮।

তৃতীয় সংস্করণ: ১৩১৮। প্রকাশক: শেখ গিয়াসুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩৫। উৎসর্গ: "পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন, স্বজাতি-বৎসল, ধর্ম্ম-পরায়ণ / সুবক্তা, উন্নতমনা, বিবিধ সদ্‌গুণ-রত্নবিমণ্ডিত— / হজরত মওলানা হাজি সুফি শাহ্/মোহাম্মদ আবুবকর পীরসাহেব কেবলা/পাকজোনাবেষু।"

তৃতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' এই পুস্তক সম্পর্কে লেখক বলেছেন: "'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী' সর্ব্বপ্রথমে প্রবন্ধাকারে 'ইসলাম-প্রচারকে' বাহির হয়, পরে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সহস্র পুস্তক বিতরিত হয়। সন ১৩১৬ সালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদক পাবনার পাদরী গোল্ড স্যাক্ সাহেব আমার পুস্তকের একখানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করেন, এবং এপিফ্যানি কাগজের সম্পাদক ১৯০৯-এর ১২ই জুন এবং ১৯শে জুনের এপিফ্যানিতে আমার পুস্তকের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাদের প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর লিখিলাম এবং আপত্তি খণ্ডন করিলাম। আর হজরত বার্ণবার আসল ইঞ্জিল হইতে হজরত মোহাম্মদের (দ:) আগমন বিষয়ক কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া অনুবাদসহ প্রকাশ করিলাম। এখন ইহার দ্বারা সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে আমার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিব। সাধারণের উৎসাহ পাইলে গোল্ড স্যাক্ সাহেবের

প্রতিবাদ পুস্তিকা ও এপিফ্যানির প্রবন্ধ ইহার সহিত অন্য সংস্করণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।"

১৩. শোকানল। প্রকাশক: শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩১৬। মূল্য: এক আনা। পৃষ্ঠা: ১৯। অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্যা: ৫। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায়: "আমার কয়েকজন পরমাত্মীয় পরলোকগমন করিলে, আমি শোকে অভিভূত হইয়া কয়েকটী কবিতা লিখিয়া সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থে ও সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত কবিতা কয়েকটী একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম। এখন সকলে ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।"

তৃতীয় সংস্করণ: ১৩২৩। প্রকাশক: শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ২৪। অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্যা: ৬। উৎসর্গ: "পরম মিত্রবর—/দিনাজপুর-ঘুঘুডাঙ্গানিবাসী—/হাজী জমিরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব/সুহৃদবরেষু।" "শোকানলে'র তৃতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করা হয়েছে: শোকানলের ভাগ্যে যে চতুর্থ সংস্করণ ঘটিবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই; এই পুস্তক সর্ব্বপ্রথমে "কোথা চলি গেলে" নামে প্রকাশিত হয়। পরে অনেকের অনুরোধে উক্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শোকানল" নাম দেওয়া হয়। এজন্য কভারে তৃতীয় সংস্করণ লেখা হইয়াছে। এবারে একটী নূতন কবিতা সংযোগ করিয়া রঙ্গিন কভারে ছাপা হইল। ইহা প্রকাশ করিতে আর আদৌ ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু জেলা জলপাইগুড়ি মালনদী টী ষ্টেটের ম্যানেজার মুন্শী আলিমুদ্দীন আহ্মদ প্রভৃতি বন্ধু-বর্গের নিতান্ত আগ্রহে প্রকাশ করা হইল। এক্ষণে সাধারণে ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।" 'বাসনা' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১৬) এই 'শোকানল' সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "লেখক

তাঁহার কয়েকজন পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যথিত হইয়া শোকানল রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অনলের সর্ব্বত্র সমান তেজ নাই। মোটের উপর কবিতাগুলি মন্দ নহে।

১৪ **শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোঁকাভঞ্জন।** প্রকাশক: হাজী জয়নাল আবেদিন, নিয়ামতপুর, রাজশাহী। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩২৩। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ৯৮+১।

এই পুস্তক সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগের (১৯১৭, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃ: ৯০) মন্তব্য: "A Religious Controversy in which the author attacks the opinions advanced by a Missionary gentleman af Tippera in his book entitled শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুনশীর ভুল।[৯৫]" এই পুস্তক সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মন্তব্য: "এটিই মুন্সী জমিরুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ রচনা।"[৯৬]

১৫. **মাসুম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা।** প্রকাশক: মুনশী আলিমুদ্দীন আহমদ, মালনদী, জলপাইগুড়ি। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩২৩। মূল্য: ছয় আনা। পৃষ্ঠা: ৭৩+৶.। উৎসর্গ: "স্বজাতি-বৎসল, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, পরম সুহৃদবর,/ মুনশী আলিমুদ্দীন আহমদ সাহেব/সুহৃদবরেষু।"

এই গ্রন্থটি পৌষ ১৩৩৫ সালে 'রদ্দে খৃষ্টান সিরিজে'র নবম পুস্তক হিসেবে 'মাসুম মোস্তফা (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা' নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক: পাদৃ মওলানা জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, ইসলামীয়া আর্ট প্রেস, ১৩৮ কড়েয়া, রোড, কলিকাতা। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ৬+৮৶.+৭১+।/.। উৎসর্গ: "আমার পরম ভক্তি-ভাজন হজরত মওলানা সৈয়দ/আবদুল্লাহ সাহেবের করকমলে আমার বড় সাধের/"মাসুম মোস্তফা (দঃ)" উপহার দিলাম।"

জমিরুদ্দীনের প্রচার-পুস্তকের মধ্যে 'মাসুম মোস্তফা' বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যুক্তি-উপস্থাপনের নৈপুণ্য, তথ্য-সন্নিবেশ, তর্ক-কৌশল ও

প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গির করণে এটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। এই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলেছেন: "(১) পাদ্রী ফাণ্ডার "মিজানুল হকে", (২) পাদ্রী রাউস্ "ইসা বা মোহাম্মদে", (৩) পাদ্রী জাকোব বিশ্বাস "ইসলামদর্শনে", (৪) গোল্ড স্যাক "ইসলামে মোহাম্মদে", (৫) পাদ্রী মনুরো "মৌলবীদিগের শিক্ষায", (৬) পাদ্রী ইমাদউদ্দীন "তাওয়ারিখ মোহাম্মদী"তে, (৭) পাদ্রী সাফদার আলি "নিয়াজনামায়", (৮) পাটী ঠাকুরদাস "সিরত মোহাম্মদ" ইত্যাদিতে কোরাণ শরীফের ৬টি আয়েত লইয়া হযরত মোহাম্মদ (দ:)-কে গোণাহগার সাব্যস্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, তাহা বাইবেল ও কোরাণ হইতে দেখান হইয়াছে।"

১৬. **আসল বাইবেল কোথায়?**। প্রকাশকাল: ১৩২৭। পৃষ্ঠা: ৫। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ১৫টি প্রশ্ন মুদ্রিত হয়েছে। প্রচ্ছদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে: "জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া মিশনের খৃষ্টান প্রচারক মিঃ কেয়ামুদ্দীন ইসাই ওরফে মোঃ কদমালি সরদার সাহেবের নিকট জিজ্ঞাস্য। আশাকরি সত্বর উত্তরদানে বাধিত করিবেন।"[২৭]

১৭. **ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য**। প্রকাশক: শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাব্যনিধি, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: সিদ্ধেশ্বর মেসিন প্রেস, ১৩ শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩২৩। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ১২। উৎসর্গ: "স্বজাতি-বৎসল, স্বধর্ম্মপরায়ণ, পরম প্রীতিভাজন/মোহাম্মদ তরিকুল্লা মিঞা সাহেব দোওয়াবরেষু—"।

এই পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার বলেছেন: "ইঞ্জিল কেতাবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন-বিষয়ক ভূরি ভূরি পেযখবরী আছে, তথাপি পাদ্রী সাহেবেরা তাহা স্বীকার করিতে চাহেননা। কিন্তু ধন্য পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেব! তিনি স্বীয় তফসিরে (সটীক নূতন নিয়মে) তাহার আগমন-বিষয়ক পেষখবরী বিস্তৃত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই তফ্সিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর বোধহয় ছাপা হইবেনা। আমি "খৃষ্টীয়-বান্ধবে" বিজ্ঞাপন দিয়া পাঁচ টাকার পুস্তকখানি

২০৲ টাকা মূল্য দিয়া একখানি মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। তাহারই মধ্য হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সংক্রান্ত পেষখবরী লিখিয়া, জনসমাজে প্রচার করিলাম। ইহার দ্বারা যদি একটী খৃষ্টানেরও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।...”

১৮. **ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য।** প্রকাশক : শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক : এ. কে. শীল, শীল প্রেস, ৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৩২। মূল্য : এক আনা। পৃষ্ঠা : ১২। উৎসর্গ : “স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও দাতাগ্রগণ্য/মুনশী মোহাম্মদ আব্বাস আলি সাহেব—”।

এই পুস্তিকাটি ‘রদ্দে খৃষ্টান সিরিজে’র দ্বিতীয় পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়। ‘বিজ্ঞাপনে’ লেখক বলেছেন : “ইঞ্জিল কেতাবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন-বিষয়ক ভূরি ভূমি পেষখবরী আছে, তথাপি পাদ্রী সাহেবেরা তাহা স্বীকার করিতে চাহেননা। কিন্তু ধন্য পাদ্রী রাউস সাহেব! তিনি স্বীয় তফসিরে (সটীক নূতন নিয়মে) তাঁহার আগমন-বিষয়ক পেষখবরী বিস্তৃত লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই তফসিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর বোধহয় ছাপা হইবে-না।... তাহারই মধ্য হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সংক্রান্ত পেষখবরী লিখিয়া জনসমাজে প্রচার করিলাম। ইহার দ্বারা যদি একটী খৃষ্টানেরও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।...”

১৯. **রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খ্রীস্টান:** প্রকাশক : শেখ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। প্রকাশকাল। ১৩৩২। মূল্য : আট আনা। পৃষ্ঠা : ১॥৵.+৫২। উৎসর্গ : “স্বজাতীবৎশল, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও পরমোৎসাহী—/কর্ম্মী নদীয়া—পোঃ গাংনি---চ্যাংগাড়া নিবাসী।/মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কাব্যবিনোদ/কবিকুলরত্ন সাহেব,”। ‘রদ্দে খৃষ্টান সিরিজে’র তৃতীয় পুস্তক।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত ভবেরপাড়া রোমান ক্যাথ-লিক মিশন কর্তৃক প্রচারিত 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' (১৮৯৯) পুস্তকে ইসলামধর্ম ও রসুলে করীম (স:) সম্পর্কে যে অবমাননা ও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় তারই প্রতিবাদে এই পুস্তকটি রচিত। মাসিক 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩৩) এই পুস্তকের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়: 'রদ্দে খ্রীষ্টান' সিরিজের ইহা তৃতীয় নম্বরের পুস্তক। মোসলমান পরিচালিত প্রায়ই সাময়িকপত্রসমূহে ইতিপূর্ব্বে যে খ্রীষ্টানী পুস্তকের সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন চলিয়াছিল এবং সে পুস্তকে "কোরাণের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম" প্রভৃতি অন্তর বিদীর্ণকারী কথা লিখিত ছিল, সেই বিষ্ঠাবমনকারী "সত্যধর্ম্ম নিরূপণ" নামক পুস্তকের দন্তচূর্ণকারী প্রতিবাদ এই পুস্তকে যথাযোগ্যভাবে করা হইয়াছে। গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত মিশনরী ছিলেন, খ্রীষ্ট-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ণরূপেই আছে, কাজেই তাঁহার কর্ত্তৃক উক্ত পুস্তকের প্রতিবাদ যে উপযুক্ত হইয়াছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস বিদ্যমান। আরও এই পুস্তকে এসলামধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যান্য সাহেব খ্রীষ্টানদের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। খ্রীষ্টান মিশন হইতে এসলাম ধ্বংসকল্পে সহস্র সহস্র পুস্তক-পুস্তিকার প্রচলন ও বিতরণের প্রতিবাদে মাত্র দু'চারখানা পুস্তক আদৌ যথেষ্ট নহে, সুতরাং যাহাতে এসলাম-বৈরী খ্রীষ্টানী পুস্তকসমূহের যথাযথ প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক মোসলমানকে স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী উক্ত লোক সাহেবকে আর্থিক সাহায্য করা বিশেষ আবশ্যক। এই ব্যাপারে সাহায্য করা ছওয়াবের কার্য্য এবং জনাব পীরসাহেব কেবলার অনুরোধ।"

২০. নামাজ পড়া-শিক্ষা। প্রকাশক: বিবি গওহরজান, মনিরজান ও কমরজান, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: নরেন্দ্রকুমার শীল, শীল প্রেস, ৩৩ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩৩২। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৩২। ষোলটি অধ্যায়ে নামাজ-আদায়ের নিয়ম-প্রণালী-করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২১. পাদ্রি মনরো সাহেবের ধোঁকা-ভঞ্জন। প্রকাশক: শাহ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: এন. বি. মজুমদার, মজুমদার প্রেস, ১০৬

আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ১৩৩৪। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৪+২০।

নদীয়া জেলার রাণাঘাটের প্রখ্যাত খ্রীস্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রী জে. মনুরো রচিত 'হজরত মোহাম্মদ-এর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামক পুস্তিকার যুক্তি খণ্ডন করে জবাব হিসেবে জমিরুদ্দীন এই পুস্তক রচনা করেন। এটি 'রদ্দে খৃষ্টান সিরিজে'র সাত নম্বর পুস্তক। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলেছেন: 'পাদ্‌ সাহেবেরা পবিত্র 'ইসলাম'কে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদের অন্তিমের কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ:) অযথা কুৎসা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে বায়ান্নখানা কেতাব লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সাতখানার প্রতিবাদ বাহির হইল। ইহা বহুপূর্ব্বে জনসমাজে প্রকাশিত হইত, কিন্তু অর্থের অভাবহেতু প্রকাশ হইতে পারে নাই।"

২২. Glory of Islam. প্রকাশক: মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: জি.বি. দে, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৮ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল: ৪ মার্চ ১৯২৯। মূল্য: আট আনা। পৃষ্ঠা: ১০৯।

এই পুস্তকটিতে পাঁচটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি 'From Christianity to Islam' জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত' পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত। অপর চারটি প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা নয়, সংগৃহীত। প্রথম প্রবন্ধ Asiatic Quarterly Review (October 1888) পত্রিকা থেকে গৃহীত, দ্বিতীয় প্রবন্ধ st. James Gazette of London (8 October 1887) পত্রিকায় মুদ্রিত 'Islam in Africa'. তৃতীয় প্রবন্ধটি 'Dr. Leitner's Lecture on Mahammedanism' এবং চতুর্থ প্রবন্ধের নাম 'An European convert to Islam in the 15th century.'

২৩. **আসল হুলিয়ানামা।** প্রকাশক: মুন্সী জামালউদ্দিন, গাঁড়াডোব, কুষ্টিয়া। পঞ্চম সংস্করণ: ১৩৮৪। মূল্য: এক টাকা চার আনা। পৃষ্ঠা: ৬। প্রচ্ছদপত্রে পুস্তিকার পরিচয় লেখা হয়েছে: "হজরত মোহাম্মদ (দ:)-এর

হুলিয়া শরীফ [।] দরুদ শরিফ, মোনাজাত, মসলা, কবর জেয়ারত, জবেহ করিবার নিয়েত, জানাজার নিয়েত ও রোজা রাখিবার নিয়েত।"

২৪. খোশগল্প।[৯৮]

২৫. উপদেশ ভাণ্ডার।[৯৯]

২৬. দুইশত উপদেশ।[১০০]

২৭. হজরত মোহাম্মদের জীবনী। জমিরুদ্দীনের 'ইসলামী বক্তৃতা' (৩য় সং: ১৩২২) পুস্তকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞাপনে' এই বইটি 'যন্ত্রস্থ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী'তে (পৃ: ১৭২) জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ-তালিকায় 'হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত' নামে এই বইটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৮. আদম মোস্তফা। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। জমিরুদ্দীনের পুত্র মুন্‌শী জামালুদ্দীনের নিকটে রক্ষিত ছিলো।

২৯. জওয়াবোন্নাছারা। আবদুল জব্বার মিয়ার প্রচেষ্টায় নোয়াখালীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩১৫। প্রকাশক: শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক: মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য: দুই আনা। পৃষ্ঠা: ৪৫।

এই পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌র নামে প্রকাশিত হলেও, রচয়িতা হিসেবে জমিরুদ্দীনের কিছু ভূমিকাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এই পুস্তকের উৎস সম্পর্কে জমিরুদ্দীন লিখেছেন: "...নোয়াখালির পাদ্রি সাহেবেরা তথাকার মুসলমানদিগের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া, প্রশ্নগুলি মুন্‌শী [মেহেরুল্লাহ] সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুন্‌শী সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব "জোয়াবোন্নাসারা" নাম দিয়া পাদ্রির প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন।"[১০১] এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ এককভাবে 'জওয়াবোন্নাছারা' পুস্তক রচনা করেন নি, তাতে

জমিরুদ্দীনেরও সহযোগিতা ছিলো। তাই জমিরুদ্দীনকে এই পুস্তকের যুগ্ম-রচনাকারের মর্যাদা দেওয়া বোধহয় অসমীচীন হবে না। জমিরুদ্দীনের 'ইসলামী বক্তৃতা' পুস্তকের (৩য় সং: ১৩২২) "মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকটে পাওয়া যায়" বলে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাতে জমিরুদ্দীনের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে 'জওয়াবোম্নাছারা'র উল্লেখও আছে।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা

মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের অনেক রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সব পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই বর্তমানে প্রায়-দুষ্প্রাপ্য। ফলে তাঁর অনেক রচনারই হদিশ পাওয়া আজ দুষ্কর। সাময়িকপত্রে তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যে কবিতা, সামাজিক ও ধর্মতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ, জীবনী ও ভ্রমণ-কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে হয়। কিছু কিছু রচনা পরবর্তীসময়ে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সামিল হয়েছে। জমির-মানসের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণের জন্য এই রচনাগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাঁর রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত তাই বিশেষ জরুরী।[১০২] এখানে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জমিরুদ্দীনের রচনার যথাসম্ভব বিস্তৃত তালিকা পেশ করা হলো।

রচনার নাম	প্রকাশনা-তথ্য
১. আসল কোরাণ কোথায়?	খ্রীষ্টীয় বান্ধব [মাসিক]। জুন ১৮৯২
২. আসল কোরাণ কোথায়? [মেহেরুল্লাহর 'ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর]	সুধাকর [সাপ্তাহিক]। ২৩ বৈশাখ ১৩০০
৩. নিশীথে [কবিতা]	কোহিনূর [মাসিক]। ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩০৫
৪. বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে	ইসলাম প্রচারক [মাসিক]। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা : জুলাই ১৮৯৯
৫. প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে?	ইসলাম প্রচারক। ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা : আগষ্ট ১৮৯৯
৬. বাইবেলে বহুবিবাহ	ইসলাম প্রচারক। ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা : সেপ্টেম্বর ১৮৯৯

রচনার নাম	প্রকাশনা-তথ্য
৭. বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা	ইসলাম প্রচারক। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০০, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, মে-জুন ১৯০০
৮. পূর্ণচন্দ্র [কবিতা]	লহরী [মাসিক]। ১ম খণ্ড ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা : ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৭
৯. মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী	ইসলাম প্রচারক। ৪র্থ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-অক্টোর ১৯০১
১০. পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ	ইসলাম প্রচারক। ৪র্থ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১
১১. প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে?	ইসলাম প্রচারক। ৪র্থ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১
১২. শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী	ইসলাম প্রচারক। ৪র্থ বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১
১৩. টমাস কার্লাইল ও ইসলাম	ইসলাম প্রচারক। ৫ম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা : মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
১৪. মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার	ইসলাম প্রচারক। ৫ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা : জুলাই-আগষ্ট ১৯০৩
১৫. ফারাক্লিত (ইংরাজী হইতে অনূদিত)	ইসলাম প্রচারক। ৫ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩
১৬. ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা	ইসলাম প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা : মে-জুন ১৯০৪, সেপ্টেম্বর ১৯০৪
১৭. মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত	ইসলাম প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা : অক্টোবর ১৯০৪
১৮. হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য	ইসলাম প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা, ১০ম সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা, ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা (সাল ও মাসের

রচনার নাম	প্রকাশনা-তথ্য
	উল্লেখ নেই : এর পরেও প্রকাশিত হয়েছিল) : নভেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫
১৯. হজরত মওলানা লুৎফল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ	ইসলাম প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা : মার্চ ১৯০৫
২০. ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা	ইসলাম প্রচারক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা : মার্চ ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫
২১. বার্ণবার ইঞ্জিল	ইসলাম প্রচারক। ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা : জুন ১৯০৫
২২. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা	ইসলাম প্রচারক। ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ৭ম সংখ্যা, ১১শ সংখ্যা : জুলাই ১৯০৫, নভেম্বর ১৯০৫ মার্চ ১৯০৬
২৩. বাইবেলের পরিবর্তন	ইসলাম প্রচারক। ৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা : ডিসেম্বর ১৯০৫
২৪. হজরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	কোহিনুর। ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
২৫. হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	কোহিনুর। ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা : পৌষ ১৩১৩
২৬. চট্টগ্রাম ভ্রমণ	ইসলাম প্রচারক। ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৪
২৭. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী	ইসলাম প্রচারক। ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
২৮. পশ্চিম ভ্রমণ	ইসলাম প্রচারক। ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩১৫
২৯. দার্জ্জিলিং ভ্রমণ	বাসনা [মাসিক]। বৈশাখ ১৩১৬
৩০. মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ	বাসনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

রচনার নাম	প্রকাশনা-তথ্য
৩১. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ	বঙ্গনূর [মাসিক]। ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা : আশ্বিন ১৩২৭
৩২. খৃষ্টধর্ম্ম-রহস্য	ইসলাম দর্শন [মাসিক]। ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩২৭
৩৩. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী	ইসলাম দর্শন। ২য় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা : আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৮
৩৪. পাদরীর স্বরূপ	মোহাম্মদী [সাপ্তাহিক]। ১ ফাল্গুন ১৩৩১
৩৫. পাদরী নেডেল জোন্স সাহেবের প্রতি	মোহাম্মদী। ৪ বৈশাখ ১৩৩২
৩৬. ইসলামে পাদ্রীর ভীষণ আঘাত	মোহাম্মদী। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
৩৭. খৃষ্টানী সংবাদ	শরিয়ত [মাসিক]। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩২
৩৮. খ্রীষ্টিয় সমাজে আট বৎসর	শরিয়ত। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩২, ভাদ্র ১৩৩২, আশ্বিন ১৩৩২
৩৯. খৃষ্টান সমাজে আট বৎসর	শরিয়তে-এসলাম [মাসিক]। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৩য় সংখ্যা, ৮ম সংখ্যা; ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৩২, চৈত্র ১৩৩২, ভাদ্র ১৩৩৩, চৈত্র ১৩৩৩, আষাঢ় ১৩৩৪, আশ্বিন ১৩৩৪ (ক্রমশ:)
৪০. তামাকের অপকারিতা	শরিয়ত। ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা : কার্তিক ১৩৩২
৪১. ইসলামে ভীষণ আঘাত	শরিয়ত। ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা : পৌষ ১৩৩২

রচনার নাম	প্রকাশনা-তথ্য
৪২. মোসলেম-হৃদয়ে দারুণ শেল। স্বামী সদানন্দের শয়তানী।	শরিয়তে-এসলাম। ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩২
৪৩. স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত	রওশন হেদায়েৎ [মাসিক]। ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা : চৈত্র ১৩৩২
৪৪. বাইবেলে বহু বিবাহ	শরিয়তে-এসলাম। ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা : আষাঢ় ১৩৩৩
৪৫. পাদ্রী সাহেবের নূতন আবিষ্কার	শরিয়তে-এসলাম। ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা: আশ্বিন ১৩৩৩
৪৬. আর্য্য-ভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা	শরিয়তে-এসলাম। বৈশাখ ১৩৩৪, আষাঢ় ১৩৩৪, শ্রাবণ ১৩৩৪, ভাদ্র ১৩৩৪
৪৭. পাদ্রির ভ্রান্তি	ইসলাম-দর্শন। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা : পৌষ ১৩৩৪ (ক্রমশ:)
৪৮. বাইবেলতত্ত্ব	তবলীগ [মাসিক]। অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, মাঘ ১৩৩৪, ফাল্গুন ১৩৩৪
৪৯. বাইবেলের পরিবর্ত্তন	শরিয়তে-এসলাম। ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫
৫০. ইছায়ী-ক্রীড	শরিয়তে-এসলাম। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

জীবনদর্শন ও সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য

জমিরুদ্দীনের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতরে। তাঁর মৌলবাদী রক্ষণশীল পিতার প্রবল প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। অচিরেই তিনি মনে মনে সেই বন্ধন শিথিল করে নিয়েছেন, স্বধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে ক্রমশ জন্ম নিয়েছে সংশয় ও জিজ্ঞাসা। তাই যে-মুহূর্তে তাঁর মনে স্বধর্মে চূড়ান্ত অনাস্থা ও খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস জেগেছে তখন কালবিলম্ব না করে তিনি সকল পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে, জনক-জননী স্বজন-বান্ধবের অনুরোধ-অনুনয়-মিনতি অগ্রাহ্য-উপেক্ষা করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। অন্তরের নির্দেশেই তিনি তা করেছেন, কোনো আবেগ বা প্রলোভন বা চাপ কাজ করে নি এখানে। আবার যখন খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় জেগেছে তখন সেই বিশ্বাসের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আলো ধরে নির্দ্বিধায় প্রত্যাবর্তন করেছেন পিতৃধর্মে। এই যুক্তি ও জিজ্ঞাসাই তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করেছে। তাঁর সীমাবদ্ধতা এখানে যে, এই যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আলো কেবল ধর্মীয়জীবনকেই আলোকিত করেছে, তাঁর জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি।

জমিরুদ্দীন ছিলেন সত্যান্বেষী। তাঁর এই অন্বেষণ জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছিল। এই নিরন্তর অন্বেষণ কখনো তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে, আবার কখনো দিয়েছে পথের দিশা। ডাইনামিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার পর যখন উপলব্ধি করেছেন এই ধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, আবিষ্কার করেছেন এর প্রচারকদের ফাঁকি ও মিথ্যাচার, তখন তাঁর আস্থা টলে উঠেছে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বলেছেন তিনি :

> তখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, বাইবেল বিকৃত হইয়াছে, দুষ্ট খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহার মধ্যে অনেক কথা যোগ ও বিয়োগ করিয়াছে, খ্রীষ্টিয়ান মিসনারী ও প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক নাস্তিক, অবিশ্বাসী,

মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ব্যভিচারী, জাত্যভিমানী, কটুভাষী আছে তাহা হইলে কখন আমি ভ্রষ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতামনা। [১০৩]

মানস-পরিবর্তনের সাক্ষ্য তাঁর জবানীতেই পাওয়া যায়:

> ...খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তি যখন বাইবেল, আর সেই বাইবেল যখন বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা যখন আমি বিশেষরূপে অবগত হইলাম, তখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আমার অনাস্থা, অভক্তি ও সন্দেহ জন্মিল। পাঠক! যে ধর্ম্মের জন্য আমি স্নেহের পিতা-মাতা, প্রাণসম ভ্রাতা-ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও সনাতন মুসলমানধর্ম্ম, এমন কি জগৎ পরিত্যাগ করিলাম, সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হইল ইহাতে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কি করি, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিনা; খৃষ্টানধর্ম্ম যে মিথ্যা হইবে ইহা পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। [১০৪]

অবশেষে ইসলামধর্মে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁর সব দ্বন্দ্ব-সংশয়ের নিরসন হয়।

সত্য-অন্বেষাই ছিলো তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তাই যখন তিনি খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামধর্মে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন মিশনারীরা তাঁকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বলেছেন তিনি:

> আমি খৃষ্টানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইব, একথা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন অনেক বড় বড় মিসনারী এ সংবাদে দুঃখিত হইলেন ও আমাকে অনেক বুঝাইলেন, বিশেষ উন্নতি করিয়াও দিতে চাহিলেন; কিন্তু আমি বলিলাম যে, "দোদেল বান্দা কলমা চোর, না পায় বেহেস্ত না পায় গোর।" [১০৫]

এই দ্বন্দ্বহীন দর্শনে উত্তরজীবনে স্থির ছিলেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনীর উপসংহারে পাঠক-সমীপে তিনি নিবেদন করে বলেছিলেন:

> আপনারা আমার জন্য খোদা-তা-আলার নিকটে প্রার্থনা করিবেন, যেন জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমাকে পবিত্র ইসলাম বিশ্বাসে স্থির রাখেন। [১০৬]

তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সার্থকভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

খ্রীস্টিয়সমাজে প্রায় একদশক অবস্থান করে এই সমাজের ফাঁকি ও অন্তঃসারশূন্যতা জমিরুদ্দীন যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-সম্প্রদায়ের তরুণদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন :

> মোসলেম যুবকগণ! সাবধান, যাহারা চাকরী বা কামিনী-কাঞ্চনের লোভে খৃষ্টিয়ান হইবেন, তাহারা নিশ্চয়ই ঠকিবেন। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতা না থাকিলে কেহ কাহারও নহে। টাকার লোভে খৃষ্টান হইয়া না একুল পায় না ওকুল পায়; শেষে পাদ্রি সাহেবের বেয়ারা, খানসামা বড়জোর পাঙ্খাওয়ালা সাজিয়া খৃষ্টিয়-স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে। স্ত্রীকে আয়াগিরি আর না হয় হাসপাতালের নার্সগিরি করিয়া জীবনযাত্রা ধর্ম্ম (?) ও প্রেমসহ নির্ব্বাহ করিতে হয়। পাদ্রি সাহেবেরা হিন্দু-মোসলমানকে খৃষ্টান করিয়া রাখিতে চায়।[১০৭]

তবে খ্রীস্টিয়সমাজে অবস্থান করে, খ্রীস্টিয়-বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে, খ্রীস্টিয় মিশনারী ও পণ্ডিতদের সাহচর্যে এসে জমিরুদ্দীন জ্ঞানস্পৃহা, পাঠ-প্রবণতা, তুলনামূলক বিচার, তর্ক ও প্রচার-কৌশল, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মতো গুণগুলো আয়ত্ত করেন। তাঁর জীবন-ধারণা ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশেও খ্রীস্টধর্ম ও খ্রীস্টানসমাজের অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

জমিরুদ্দীন ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী প্রশস্ত মনের মানুষ। 'আসল কোরাণ কোথায়' এই বিষয়ে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বিতর্ক হয়। এই বিতর্কে তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে পরাস্ত হন। এই পরাজয় তিনি শুধু মেনেই নেন নি, মেহেরুল্লাহ্‌র যুক্তি-প্রমাণের সূত্র ধরে নতুন বিশ্বাস ও সত্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো একান্তই যুক্তি ও প্রমাণ-নির্ভর। তাই অন্যের মতকে যখন গ্রহণ করতে পারেন নি, তখন তা যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই খণ্ডন করেছেন বা ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অন্যের মতকে অস্বীকার করতে গিয়ে অসহিষ্ণু হন নি কিংবা বিদ্বেষ-প্রচার বা কটু মন্তব্য প্রকাশ বা কুযুক্তি প্রয়োগ করেন নি। একটি পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী তার্কিকের দৃষ্টি অনুসরণ করেই ভিন্ন মত ও বিরোধী আদর্শের মোকাবেলা করেছেন।

ধর্মীয় চেতনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত হয়েছে। তবে নিছক পারলৌকিক পরিত্রাণের আশায় তিনি ধর্মচর্চা করেন নি, ধর্মকে

জীবিকার উপায় হিসেবে মনে করেন নি, কিংবা ধর্মশাস্ত্রকে নিষ্প্রাণ পুঁথি হিসেবেও গ্রহণ করেন নি। তিনি ধর্মচর্চাকে গভীর অর্থে জীবনচর্চার সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। তথাকথিত মৌলানা-মৌলবীদের কেবল শাস্ত্রের আদেশ-নিষেধ ব্যক্তিগত জীবনে পালনের মধ্যদিয়ে আর ওয়াজ-নসিহত করে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি লোক-শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর ধর্মভাবনা ও চর্চার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে তা একটি প্রয়োজনীয় শক্ত সামাজিক ভিত্তি খুঁজে নিতে পেরেছিল। তাই তাঁর জীবনবোধ, ধর্মধারণা ও সমাজহিতকামনা একই বিন্দুতে এসে মিশেছিল। স্বচ্ছ-সুস্থ ধর্মজীবন অনুশীলনের জন্য তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করা যে একান্ত প্রয়োজন তা দৃঢ়ভাবে মনে করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, পবিত্র, ফলপ্রসূ ও ছন্দোময় জীবনযাপনের জন্য পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ ধর্মবোধ ও ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজন সমধিক।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের লেখক জীবনের পশ্চাতে শিল্প-প্রেরণা ছিলো অনুপস্থিত। ধর্মীয় প্রেরণা ও সামাজিক প্রয়োজনের অনুরোধেই মূলত তাঁকে লেখনী ধারণ করতে হয়। তাঁর সাফল্য এখানে যে তাঁর মিশন সার্থক হয়েছিল, প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। জমিরুদ্দীনের রচনার মধ্যে তাঁর মনন-চেতনা-ব্যক্তিত্ব ও দর্শনের পরিচয় মেলে। এক অর্থে তাঁর রচনাবলী তাঁর সংগ্রামী জীবনেরই প্রতিভাস। তিনি ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর রচনাবলি তাঁর সেই উৎসর্গীকৃত জীবনেরই কর্ম-ভাষ্য।

সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা

একজন মানুষকে অনিবার্যভাবেই তাঁর সময় ও সমাজকে স্পর্শ করতে হয়। হয়তো সেই স্পর্শ আলতো বা পরোক্ষ হতে পারে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম নেই। এই অর্থে মুন্‌শী জমিরুদ্দীন তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে সমাজ ও রাজ-নীতিসচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ-কথা বলা চলে। উনিশ-বিশ শতকে ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী মুসলমান সমাজে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে জমিরুদ্দীন ছিলেন তার অন্যতম নেতৃপুরুষ। সমাজচেতনাবোধ

তাঁর প্রবল ছিলো, সমাজহিতকামনা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস তাঁর স্ব-সমাজের সীমানা অতিক্রম করে নি। অবশ্য এ-কথা স্মরণ করতে হয় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ ব্যক্তিত্বের সমাজহিতকামনাও তাঁদের নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। জমিরুদ্দীনের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতিচেতনার পরিচয় তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড

জমিরুদ্দীন সমকালীন প্রায় সব নেতৃস্থানীয় মুসলিম সভা-সমিতির সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। শুধু যুক্ত থাকা নয়, এসব সভা-সমিতিতে তিনি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। তাঁর এই সাংগঠনিক তৎপরতা বিশেষ স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়:

> বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-সভা, সামাজিক সভা, শিক্ষাবিধায়িনী সভা প্রভৃতির অধিবেশন হইতেছে। বিখ্যাত আলেমগণ—অর্থাৎ মৌলবী-মৌলানাগণ এবং বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তাগণ ঐ সকল সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছেন। এই সকল সভা-সমিতির দ্বারা সমাজের অসাধারণ উপকার সাধন হইতেছে। আদর্শ পীর-মোর্শেদ ও হাদী জনাব মৌলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব বঙ্গীয় ওয়ায়েজ ও বক্তাগণের অগ্রণী। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে মৌলবী খবিরুদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্শী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সেরাজগঞ্জী সাহেব, সুফি ময়েজুদ্দীন ওর্ফে মধু মিঞা সাহেব, মৌলবী সৈয়দ আবদুল কদ্দুছ সাহেব, মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব (ময়মনসিংহ), শাহ আবদুল্লা সাহেব, সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব, মৌলবী আহ্মদউল্লা সাহেব, মৌলবী ফজলোর রহমান সাহেব, দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহ্মদ সাহেব, দেওয়ান শমসউদ্দীন আহ্মদ সাহেব প্রভৃতি প্রধান।[১০৮]

মুন্শী জমিরুদ্দীন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৩১০ সালের ২০ ও ২১শে চৈত্র রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় এই সমিতির এক বিরাট অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে

সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী সৈয়দ শামসুল হোদা এম.এ.বি. এল (১৮৬২-১৯২২)। জমিরুদ্দীন এই অধিবেশনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ উত্থাপিত তৃতীয় এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) উত্থাপিত চতুর্দশ সংখ্যক প্রস্তাবটি যথাক্রমে সমর্থন ও অনুমোদন করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়: "এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এস্‌লামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত থাকা কর্ত্তব্য।" রাজশাহী-অধিবেশনে মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুরকে পৃষ্টপোষক, সৈয়দ শামসুল হোদা ও খানবাহাদুর মীর্জা সুজাত আলী বেগকে সভাপতি এবং মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি.এ.বি.এল.-কে সম্পাদক করে সমিতির যে স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি গঠিত হয় মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সেই নির্বাহী পর্ষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১০১]

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৩১২ সালের ৯–১০ বৈশাখ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমগাঁয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খানবাহাদুর প্রিন্স আলি নওয়াব চৌধুরীর বাসভবনে। এই অধিবেশনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের সঙ্গে জমিরুদ্দীনও যোগদান করেছিলেন।

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' পরবর্তীতে যখন 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'তে ('Provincial Muhammadan Educational Conference, Eastern Bengal and Assam') রূপান্তরিত হয় তখনো মুন্‌শী জমিরুদ্দীন এই সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় ১৩১৩ সালে (ইং ১৯০৬) অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের প্রস্তুতি-কার্যক্রমে জমিরুদ্দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। তিনি লিখেছেন:

> পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান [শিক্ষা] সমিতির সভাপতি মোস্‌লেম কুল-রত্ন, পরম ভক্তিভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল নওয়াব খাজা সলিমউল্লাহ সি.আই.ই. বাহাদুর। উঁহার সম্পাদক মুসলমান কুল-গৌরব পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল

খানবাহাদুর মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেব। এই বৎসরে ঢাকাতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হওয়াতে, আমি উক্ত ঢাকার নওয়াব বাহাদুর ও খানবাহাদুর কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান [শিক্ষা] সমিতির পক্ষ হইতে প্রচারক নিযুক্ত হইয়া ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, ঢাকা, নোওয়াখালি, ফেণী, সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়াছি।[১১০]

এ-ছাড়া তিনি চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানেও উক্ত অধিবেশনের সাফল্যের জন্য গণ-সংযোগ করেন। নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষাসমিতির এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের সার্বিক সাফল্য ও প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য জমিরুদ্দীনের সাংগঠনিক সফর বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। এই সম্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁরও প্রাপ্য। এখানে স্মরণ করতে হয়, এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

১৩১৪ সালের পৌষে করাচীতে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। খানবাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে মুন্‌শী জমিরুদ্দীন এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁর বর্ণনায় জানা যায়:

করাচীর শিক্ষা-সমিতিতে বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান, বর্ম্মা, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ ইত্যাদি ভারতের প্রায় সর্ব্ব প্রদেশ হইতেই ডেলিগেট ও মেম্বরগণ যোগদান করিয়াছিলেন। শামসুল ওলামা মওলানা খাজা আলতাফ্ হোসেন হালি পানিপত্তি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১১১]

জমিরুদ্দীন ১১ পৌষ করাচীতে পৌঁছান। বলেছেন তিনি:

করাচী নগরে পৌঁছিয়া "সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি"তে যোগদান করি। দুই দিবস শিক্ষা-সমিতিতে ও দুই দিবস লিগে যোগদান করিয়া করাচী নগর ভ্রমণে বাহির হই।[১১২]

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষ-সমিতি'র দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯শে এপ্রিল ময়মনসিংহে। এই অধিবেশনে উত্থাপিত ২২ সংখ্যক প্রস্তাবটিতে বলা হয়, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম

বিভাগের মতো এ্যাংলো-পার্শিয়ান ডিপার্টমেন্ট-সম্বলিত কোনো মাদ্রাসা রাজশাহী বিভাগে নেই। এই বিভাগে সিরাজগঞ্জে একমাত্র যে 'হাই স্ট্যাণ্ডার্ড মাদ্রাসা' আছে তার সঙ্গে যুক্ত করে একটি হাইস্কুল চালু করা হোক। মুন্শী জমিরুদ্দীন এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন। জমিরুদ্দীন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও যে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন, তা এই প্রস্তাবে বোঝা যায়।

১৩১০ সালের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন শেষে ২৩ চৈত্র সমাগত অধিকাংশ ডেলিগেট ও স্থানীয় সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মৌলবী ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'বঙ্গীয় ইস্‌লাম-মিশন সমিতি' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। রংপুরের মহীপুরের জমিদার খানবাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী এবং 'ইসলাম-প্রচারক' ও 'সোলতান'-সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ এই সমিতির যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। জমিরুদ্দীন ছিলেন এর কার্য-পরিচালক সমিতির অন্যতম পরিচালক। এই 'বঙ্গীয় ইসলাম-মিশন সমিতি' গঠনে জমিরুদ্দীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

"বঙ্গের সর্ব্বত্র ধর্ম্মসভা স্থাপনপূর্ব্বক সমাজস্থ লোকদিগকে স্বধর্ম্মে আস্থাবান করা", "সর্ব্বত্র বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে এবং স্বীয় সমাজে সনাতন ইসলামধর্ম্মের প্রচার"--উদ্দেশ্যেই এই সমিতির জন্ম। বলা হয়েছিল:

> অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম-ভাস্করের সমুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মিদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম-ধর্ম্ম ও মোসলেমসমাজের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যক মত আক্রমণ-গুলির প্রতি-উত্তর প্রদান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের প্রকাশিত ইসলাম-ধর্ম্মের গ্লানিকর ট্রাক্ট বা পুস্তিকাগুলির প্রতিবাদ-করণ, এবং বিধর্ম্মি-দিগের আরোপিত সন্দেহভঞ্জন, হতচেতন মোসলেমসমাজের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম বিস্তৃতি এবং ইসলামধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট বা পুস্তিকা এবং পত্রিকাদি প্রকাশ করা।[১১৩]

মিশন সমিতির এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে জমিরুদ্দীনের কার্যক্রমের সঙ্গতি ও সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়।

সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমীর (১৮৬৭-১৯২৩) উদ্যোগে ১৩১১ সালে তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালীতে 'আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই এরসঙ্গে জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তিনি এর প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই যোগ দিতেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

আঞ্জমনের ১৩১২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে জানা যায়, জমিরুদ্দীন কুমারখালীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কুমারখালীতে আঞ্জমনের যে ষষ্ঠ অধিবেশন (১৩১৭: জুলাই ১৯১১) হয় তাতে তিনি যোগ দেন এবং অধিবেশনের তিন নম্বর প্রস্তাব সমর্থন এবং ছয়, তেরো ও আঠারো নম্বর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিন নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়:

That this conference supports the Bill introduced by Honourable Mr. Gakhale for free and compulsory Primary education and resolves that to give effect to this scheme if taxes are to be imposed, the sum that will be realised from the Mahammadan population of the Province may be spent for Mahammadan Education only.

ছয় নম্বর প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়:

That considering that the number of Muktabs exceeded 200 in this district this conference reasonably demands the establishment of a Mianji Training School for the training of teachers of this class of institutions.

তেরো নম্বর প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য:

That as owing to the backwardness of the mohammadans in point of education the number of litigation among them are daily increasing this conference resolves that Panchayats may be established in each village to settle their disputes amicably.

এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে জমিরুদ্দীনের শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মীয় শিক্ষাকেই সবসময় তিনি প্রাধান্য ও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন:

> ... অশিক্ষিত মুসলমানগণকে কোরআনের শিক্ষা দাও; জুমার খোৎবাকে বাঙ্গালায়, কোরআনের তর্জমা লোকদিগকে বুঝাও ...। ... পীর ও আলেমগণ, ভূয়া কথায় নিজেদের পকেট গরমের ব্যবস্থা ছাড়িয়া চাঁদা তুলিয়া গরীব মুছলিমদিগকে শিক্ষা দাও।[১১৪]

আঞ্জমনের প্রতিবেদনে জমিরুদ্দীন খ্রীস্টান মিশনারীদের মোকাবিলায় যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার স্বীকৃতি জানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল:

> ... খোদাতাল্লার ফজল করমে অত্র আঞ্জমন এবং অন্যান্য ওলামা ও ওয়ায়েজ বক্তাগণের যত্নচেষ্টায়- বিশেষতঃ আমাদের অন্যতম সুহৃদ্ এসলাম প্রচারক মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের লেখনী-প্রসূত 'রদ্দে নাছারা' প্রভৃতি ও অন্যান্য লেখকের আরও কতিপয় পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন খৃষ্টান সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। নূতনভাবে আর কেহই এই ধর্মের প্রলোভনে পতিত হইতেছেনা, বরং যীশু ভক্তগণই মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; এই আনন্দ-দায়ক সংবাদই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।[১১৫]

ফুরফুরার পীর মুহম্মদ আবুবকর সাহেবের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জমনে ওলামায়ে-বাঙ্গালা'র (১৯১৪) সঙ্গেও জমিরুদ্দীন প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। প্রথম কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯২১ (১৩২৮) সালের কমিটিতেও তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। আঞ্জমনের কার্যক্রমের সঙ্গে তিনি পূর্বাপর জড়িত ছিলেন। 'জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দে'র সঙ্গেও জমি-রুদ্দীনের যোগ ছিলো। কলকাতায় ১৯২৬ সালের ১১-১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত 'জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দে'র সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে জমিরুদ্দীন প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।[১১৬] অবশ্য কখনো কখনো তিনি এসব সভা-সমিতির ভূমিকার সমালোচনাও করেছেন। ধর্মীয় জনশিক্ষার কাজে এঁদের শৈথিল্য ও নির্লিপ্ততার সমালোচনা করে জমিরুদ্দীন বলেছেন: "জমিয়তে

ওলামা ও অন্যান্য আঞ্জুমনকে বলিয়া কি হইবে? তাঁহাদের এদিকে লক্ষ্য করিবার সময়াভাব। অথচ তাঁহারাই নাকি ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন।"[১১৭]

জমিরুদ্দীন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই মুসলিম পরিচালিত সভা-সমিতির অধিবেশন-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এসব অধিবেশনের কার্যক্রমে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, বক্তব্যে-আলোচনায় মুসলিম জাগরণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৩০৯ সালের ২৮ বৈশাখ (১১ মে ১৯০২) কুষ্টিয়া শহরে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়া মহকুমা ছাত্র সমিতির ('Students' Majkaratul Islam -i-Kushtia') ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। এই অধিবেশনে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, কবি মোজাম্মেল হক, মীর মশাররফ হোসেন, রওশন আলী চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[১১৮] ১৩১৩ সালের ১৫-১৭ চৈত্র (২৯-৩১ মার্চ ১৯০৭) বরিশাল শহরে 'বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট মোহামেডান এডুকেশনাল কন্ফারেন্স'-এর যে অধিবেশন হয় তাতেও জমিরুদ্দীন অংশগ্রহণ করেন।[১১৯] মুর্শিদাবাদে ১৩১৬ সালের ১১-১২ বৈশাখ 'জাতীয় সভা'র যে অধিবেশন হয় তাতে জমিরুদ্দীন অতিথি-বক্তা হিসেবে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। জানিয়েছেন তিনি:

> বিগত ১লা বৈশাখ [১৩১৬] তারিখে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান খানবাহাদুর মৌলভী ফজলে রব্বি সাহেব আমাকে পত্রদ্বারা জানান যে, আগামী ১১ই ও ১২ই বৈশাখ তারিখে নবাব বাহাদুরের বাড়ীতে জাতীয়-সভার অধিবেশন হইবে। আপনি সভায় যোগদান করিয়া একতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে বাধিত হইব।[১২০]

১৩১৩ সালের ১৮-২০ বৈশাখ ডায়মন্ডহারবারে 'আঞ্জুমনে হেমাএতে এসলামে'র সভা এবং ১৩১৭ সালের ৪-৬ চৈত্র হুগলীর পাহাড়পুরে অনুষ্ঠিত 'আঞ্জুমনে মঈনল ইসলামে'র ১ম বার্ষিক অধিবেশনে জমিরুদ্দীনকে অন্যতম আলোচক হিসেবে উপস্থিত দেখি। মনে রাখতে হবে, এখানে প্রদত্ত জমিরুদ্দীনের সভা-সমিতির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তাঁর সমগ্র জীবনের কার্যক্রমের একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র।

জমিরুদ্দীন ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র সঙ্গে জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তিনি ১৩২৫ সালে

ঢাকায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে'র একাদশ অধিবেশনের জন্য গঠিত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সাধারণ পরিষদ দশজন সদস্য সম্মিলন-সমিতির জন্য নির্বাচন করবেন এমন নিয়ম ছিলো। এই নির্বাচিত সদস্য দশজন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্ব্বাহক-সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া 'সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি' নামে সম্মিলনের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন"। জমিরুদ্দীন এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি ছাড়া আর যে-তিনজন মুসলমান সদস্য-পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা হলেন ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক ও কোচ-বিহারের মোহাম্মদ আবদুল হালিম। তিনি ছিলেন মেহেরপুরের গাঁড়াডোবের 'নদীয়া সাহিত্য-সভা' নামীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা। জমিরুদ্দীন 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[২১] এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে যখন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯১১) নামে নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে তখনো এর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হয় নি।

প্রকৃতপক্ষে জমিরুদ্দীনের সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা-চেতনা এসব সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই বিকাশের বিশেষ সুযোগ লাভ করে।

সমাজদৃষ্টি ও রাজনীতিচেতনা

মূলত ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই নিজের সমাজ ও সম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামনা করেছিলেন জমিরুদ্দীন। তাঁর সমাজচিন্তার প্রত্যক্ষ পরিচয়যুক্ত রচনার সংখ্যা খুবই স্বল্প। এরমধ্যে তাঁর 'মুসলমানসমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন:

> বক্তৃতা প্রদানের দ্বারা এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্লেদ কুসংস্কার দূর করবার সাধ্যানু-যায়ী চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বিরোধিতা করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন, তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহুবিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমন কি অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে জমিরুদ্দীন বিস্ময়কর বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে 'মুসলমান-সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' প্রবন্ধটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে নিপীড়িতা নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বিদ্যাসাগরের মতই তিনি বেদনার্ত এবং উচচকণ্ঠ। প্রবন্ধটিতে জমিরুদ্দীন নারীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি এবং নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন ঘোষণা করেছেন।[১২৫]

সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তামাক সেবনের কুফল ও অপকারিতা সম্বন্ধেও জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এই অপকারিতা ঘোষণার জন্য তিনি ধর্মীয় দৃষ্টান্তের আশ্রয় না নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যকে অবলম্বন করেছেন। জমিরুদ্দীন যে-সব সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধর্মীয়-প্রসঙ্গের পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্যও ছিলো শিক্ষা-প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, আর্থিক উন্নয়ন ইত্যাদি। সঙ্গত কারণেই এ-সব বিষয় কমবেশী জমিরুদ্দীনকেও স্পর্শ করেছিল।

সমাজের দুরবস্থা ও অবক্ষয় যে জমিরুদ্দীনকে ব্যথিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই যখন তিনি 'আসল বাঙ্গালা গজল' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন তাতে অন্তর্ভুক্ত গজল ও কবিতার সবগুলোই নিছক ধর্মীয় প্রসঙ্গে রচিত ছিলো না, কোনো কোনোটিতে সামাজিক প্রসঙ্গ বা জাতীয় উদ্দীপনার পরিচয় আছে। জমিরুদ্দীনের নিজের রচিত একটি গজলে (চতুর্দশ সংস্করণের পঞ্চম গজল) হিন্দু-মুসলমানের মিলনে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে:

হিন্দু আর মোছলমানে,
এক মনে এক প্রাণে,
সম্মিলিত একস্থানে,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

এই কাঙ্ক্ষিত মিলনকে তিনি 'শুভ-সম্মিলন' বলে উল্লেখ করে বলেছেন 'জীবনে এ শুভক্ষণ'। সামাজিক সহাবস্থান ও অগ্রগতির জন্য তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অষ্টম গজলটি ভোলার কবি মোজাম্মেল হক (১৮৮৫-১৯৭৬) রচিত। এই দীর্ঘ পদ্যরচনাটি অবক্ষয়িত

মুসলমান সমাজের একটি নিপুণ চালচিত্র হিসেবে গৃহীত হতে পারে। বাঙালী মুসলমানের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার কারণ ও বিবরণ এখানে পদ্যাকারে বিবৃত হয়েছে। "নিজ্জীব বাঙ্গালী তোরা কে দেখিবি আয়" বলে কবি এখানে পরপর অবক্ষয়ের চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। আলস্য, প্রাণশক্তিহীনতা, কর্মোদ্যোগের অভাব, উচচতর জীবনের আকাঙ্ক্ষাহীনতা, জীবিকার প্রয়োজনে নিম্ন-পেশাকে গ্রহণ করে কৃতার্থমন্যতাবোধ—এসব ত্রুটির ধারাবাহিক বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। নবম সংখ্যক গজল হিসেবে চিহ্নিত রচনাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) একটি সুপরিচিত কবিতা ('জীবনসঙ্গীত')। উদ্দীপনামূলক এই কবিতায় কর্মের প্রতিজ্ঞা-পালনের ভেতর দিয়ে দুর্লভ মানবজীবনকে সার্থক করার উদাত্ত আহ্বান আছে। এই কবিতার মূল সুর উত্থানরহিত স্বজাতির মধ্যে সঞ্চারিত করার আকাঙ্ক্ষা জমিরুদ্দীনের ছিলো। হেমচন্দ্রের এই কবিতাটি এই পুস্তকে সংকলিত করার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জমিরুদ্দীন যে অত্যন্ত সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই মোজাম্মেল হক বা হেমচন্দ্রের এই কবিতা দু'টি সংকলন করেছিলেন তাতে কোনো সংশয় নেই।

কেবল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ নয়, অঞ্চল ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার গৌরববোধও জমিরুদ্দীনের মধ্যে ছিলো। দূর-প্রবাসে গিয়েও বাঙালীত্বের অহংকার ত্যাগ করেন নি। তিনি যখন এলাহাবাদ সেন্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে পড়াশুনা করতেন, তখনকার কথায় বলেছেন:

> আমরা এক ক্লাসে বম্বে, ইরান, গোরক্ষপুর, বেনারস, ফয়জাবাদ, গাজিয়াবাদ, জব্বলপুর, মৃজাপুর, নেপাল, ভোটান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের ছাত্র অধ্যয়ন করিতাম। বঙ্গের একমাত্র ছাত্র কেবল আমি একাই ছিলাম। আমি বাঙ্গালী বলিয়া সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পরীক্ষায় আমি প্রত্যেকবারেই সর্ব্বোচচ স্থান অধিকার করিতাম, ইহাতে তাহারা সকলেই আমার নিকট নত হইয়া থাকিত ও বাঙ্গালী জাতির প্রশংসা করিত।[১২৩]

জমিরুদ্দীনের রাজনৈতিক মতামত ও চিন্তা-ধারণা সমকালীন মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ও ফুরফুরার পীর মুহম্মদ আবুবকর এবং মুসলিম-পরিচালিত সাময়িকপত্র বিশেষ করে 'ইসলাম-

প্রচারকে'র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।[১২৪] তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতায় জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতিপোষক ছিলেন, সরকারবিরোধী কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড তিনি অনুমোদন করেন নি। দাবী-দাওয়া আদায় কিংবা সমস্যা-মোচনের উপায় হিসেবে আবেদন-নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। রাজ-সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে তিনি নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন।

জমিরুদ্দীন 'মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৬ (১৩১৩) সালে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র ঢাকা-অধিবেশনেই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নব-গঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র ছিলো। ১৩১৪ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি বঙ্গ-প্রদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ (১৮৬৬-১৯১৫) ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে জমিরুদ্দীন তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন।

ব্রিটিশের তুরস্ক-নীতি বঙ্গ-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ধর্মীয় অনুভূতির সূত্র ধরে তুরস্কের প্রতি এদেশের মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন দানা বাঁধে। এ-ক্ষেত্রে জমিরুদ্দীনের জন্য যা সঙ্গত ছিলো তা তিনি না করে তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ক্রম-বর্ধমান মুসলিম জনমতের বিপক্ষে ও ব্রিটিশ-রাজের সপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই তৎপরতাকে অভিনন্দিত করে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ জানুয়ারী ১৯১৫ এক পত্র প্রেরণ করেন:

> I am glad to learn that at a meeting held at the Garadab Bahadurpur School premises on the 15th ultimo you have explained to the Muhammedans and Hindus assembled the real state of affairs as regards The war with the Turkey. I wish to convey my thanks to you for this loyal effort on your part.[১২৫]

মুনশী জমিরুদ্দীন রাজভক্তি ও রাজানুগত্য প্রদর্শনে কখনো শৈথিল্য করেন নি। ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো আন্দোলনই তাঁর

বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা সমর্থন লাভ করে নি। যাঁরা এসব আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন জমিরুদ্দীন তাঁদের প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। খ্রীস্টান-মিশনারীদের ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ ও আপত্তিকর পুস্তক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান সমাজ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না গ্রহণ করায় কিছুটা ব্যঙ্গ ও ক্ষোভ মিশিয়ে এই উদ্যোগহীন নির্লিপ্ততার প্রতি ইঙ্গিত করে জমিরুদ্দীন বলেছেন: "...খেলাফতি দল কোথায়? স্বরাজ দল কোথায়? ধর্ম্মের জন্য তোমাদের নাকি প্রাণ পুড়িয়া ছাই হইয়াছিল এখন কাজের বেলায় পাইনা কেন?"[১২৬]

জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম পর্যায় হিসেবে স্বরাজ ও স্বাধীনতাকামী জনগণ ক্রমশ যখন তীব্রতর আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেছে, তখনো জমিরুদ্দীন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি সর্বাত্মক চেষ্টায় রাজশাহী জেলায় এই আন্দোলনের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রয়াস বাংলা সরকারের সহৃদয় স্বীকৃতি অর্জন করে। রাজশাহীর কমিশনারের স্বাক্ষরে ৭ মার্চ ১৯৩১ তারিখে 'Government of Bengal'-এর একটি স্বীকৃতি-পত্র তাঁকে প্রদান করা হয়:

> By order of His Excellency the Governor of Bengal this certificate is presented, as a mark of approbation, to Maulvi Jamiruddin Vidyabinode in recognition of his services in opposing the Civil Disobedience Movement in Rajshahi District in 1930.[১২৭]

রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীল ধারণা ও বিশ্বাস রাজানুগত্য ও রাজস্তুতির খাতেই প্রবাহিত হয়েছিল।

সমালোচক লক্ষ্য করেছেন:

> ···সচেতনভাবেই জমিরুদ্দিন দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সংযোগরক্ষা করে এসেছেন। তাঁর বক্তৃতা করবার বিস্ময়কর ক্ষমতা এবং জনমত গঠনের দক্ষতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের স্বার্থে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি এককালে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার সাথে জমিরুদ্দিনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁর রাজনৈতিক মানসগঠনে ও চিন্তাধারায় এই সম্পর্কের প্রভাব স্মরণ করা দরকার। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন কংগ্রেসী-স্বদেশী-

সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে বাংলাদেশের আকাশবাতাস মুখরিত, সরকার-বিরোধিতায় দেশের জনমন উত্তেজিত 'ইসলাম-প্রচারক' তখন মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে রাজভক্তি প্রচারে এবং সর্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধিতায় সর্বপ্রযত্নে আত্মনিয়োগ করেন। 'ইসলাম-প্রচারকে'র সহযোগীরূপে জমিরুদ্দিন তৎকালে যে রাজনৈতিক দীক্ষালাভ করেছিলেন তারই অনুসরণ করেন তিনি পরবর্তীকালে দশের যুগে, বিশের যুগে এবং ত্রিশের যুগের প্রারম্ভে।[১২৮]

জাতীয় জীবনের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল স্রোতোধারার সঙ্গে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠ অংশের যে বিচ্ছিন্নতা জন্মেছিল জমিরুদ্দীন ছিলেন সেই ধারারই পথিক। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর এই আন্দোলন-বিমুখ ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড ছিলো কালবিরোধী—যুগচেতনার বিপক্ষে।

মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন

যাঁর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য জমিরুদ্দীনের জীবনচেতনায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি মুনশী মেহেরুল্লাহ। জমিরুদ্দীনের ইসলামধর্মে পুনঃ প্রত্যাবর্তন এবং উত্তরকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের মূলে মেহেরুল্লাহর ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। মেহেরুল্লাহর সঙ্গে 'আসল কোরাণ কোথায়' এই বিতর্কের সূত্র ধরে জমিরুদ্দীনের ভ্রান্তিমোচন হয় এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মকথায় জমিরুদ্দীন আফসোস করেছেন, 'বঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান' পুস্তক ও মেহেরুল্লাহর মতো প্রচারকের সাক্ষাৎ পেলে মিশনারীদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতেন না তিনি।

মেহেরুল্লাহর সঙ্গে জমিরুদ্দীনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন 'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ। মেহেরুল্লাহ জমিরুদ্দীনকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁকে সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মেহেরুল্লাহর প্রচেষ্টার কোনো তুলনা হয় না। ১৩০৪ সালের ১৮ বৈশাখ আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণা-মিশ্রিত এক পত্রে মেহেরুল্লাহ লেখেন :

> আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটী প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশ করুন, যদি

ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার বহন করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমরা দূরদারাজস্থ ধর্ম্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।[১২৯]

মেহেরুল্লাহ্‌র পরামর্শ ও উপদেশ অনুসরণ করে জমিরুদ্দীন কালক্রমে বঙ্গ-বিখ্যাত প্রচারক ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহ্‌র উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত' পুস্তিকায় জমিরুদ্দীনকে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি যে আবেদন প্রচার করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

শেখ সাহেব মুসলমানধর্ম্ম প্রচারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এখন উপযুক্ত সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা এস্‌লামবিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গর্ব খর্ব করিতে পারিবেন। অতএব, হে স্বধর্ম্ম-হিতৈষী মুসলমান ভ্রাতাগণ আপনারা সত্বরেই উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়া তাঁহার সুমধুর ওয়াজ শুনিয়া জীবন সার্থক ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দ্বারা ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে উৎসাহিত করুন।

ব্রত ও কর্মে এই দুই সমানধর্মার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৩০৪ সালের ১৩ ফাল্গুন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার পান্টী গ্রামে এক ধর্মসভাকে কেন্দ্র করে। এই ধর্মসভার বিবরণ দিতে গিয়ে মেহেরুল্লাহ্‌ জমিরুদ্দীন সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল ধারণা দিয়েছেন :

আমি নিজে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছি ও অনেক বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্ম্মভাবে বিভোর হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও নয়ন-গোচর হয় নাই। হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ। আমাদের কি সৌভাগ্য! কি গৌরবের বিষয়। খৃষ্টান মিসনারীগণ সহস্র সহস্র টাকার শ্রাদ্ধ

করিয়াও যাদৃশ একটী রত্নলাভ করিতে পারিতেছেননা, আমরা কেবল সত্য সনাতন ইসলামধর্ম্মের পবিত্র শক্তি বলেই তাদৃশ একটী অমূল্য রত্নলাভ করিয়াছি। কিন্তু হা মোসলেমসমাজ! তুমি কি সেই মহারত্নের গৌরব বুঝিবে? হে স্বধর্ম্মহিতৈষী মুসলমানগণ! অন্ততঃ একদিন তাঁহার মধুমাখা মুখের সুধাময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক কর।[১৩০]

এই আবেগমণ্ডিত বিবরণে জমিরুদ্দীনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি জমিরুদ্দীনের জন্য মেহেরুল্লাহ্‌র অনুভূতি ও আন্তরিকতার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুকাল পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গে অসংখ্য সভাসমিতিতে যোগদান করেছেন। জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহকারিতা মেহেরুল্লাহর মিশনকে আরো গতিময় ও ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। এই সময়কালে, বলা চলে, জমিরুদ্দীন ছিলেন মেহেরুল্লাহ্‌র ছায়াসঙ্গী। দশ বছর মাত্র তাঁদের সাহচর্যের বয়স, তবুও এই সময়কালের পরিসরেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক কীর্তিময় গভীর সৌহার্দ্যের বন্ধন।

জমিরুদ্দীন গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশনার বিষয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা বরাবর লাভ করে এসেছেন। তাঁরই অনুরোধ ও প্রেরণায় রচিত হয় 'হজরত ঈসা কে' পুস্তক। পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে যথাযথ সংশোধনও করে দেন তিনি। পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌কেই উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গ-পত্রে জমিরুদ্দীন যে-বক্তব্য পেশ করেছেন তা নিছক বিনয় বা সৌজন্য নয়, আক্ষরিক অর্থেই সত্য:

মহাত্মন!
মুসলমানসমাজে যদি কেহ আমার হিতৈষী বন্ধু থাকেন, তাহা হইলে আপনি। কারণ আপনি আমার যত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এত আর কেহ করেন নাই। এইজন্য আপনাকে আমি অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। আপনার ঋণ জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিবনা। আপনি অধঃপতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতি-কল্পে স্বীয় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; সুতরাং মৎপ্রণীত "হজরত ঈসা কে?" আপনার সুপবিত্র কর-কমলে শোভা পাইবে আশায় অর্পণ করিলাম।

জমিরুদ্দীনের 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' পুস্তকটির পরিকল্পনা ও প্রকাশনাতেও মেহেরুল্লাহ্‌র ভূমিকা ছিলো।

অগ্রজপ্রতিম বান্ধব মেহেরুল্লাহ্‌র অন্তিমকালের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেছেন জমিরুদ্দীন:

> আমি (গ্রন্থকার) তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ২১শে জ্যৈষ্ঠ [১৩১৪] ছাতিয়ানতলায় গমন করি। শয়নাগারে প্রবেশ করিলেই তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে "আচ্ছালামো আলায়কুম" বলিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলামনা। মুখের দিকে চাহিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক! তিনি আমার গায়ে হাত দিলেন এবং কি কি বলিলেন বুঝা গেলনা। সেইদিন রাত্রিতেই আমি কলিকাতায় মুসলমান ডাক্তার আনিতে রওয়ানা হই, কিন্তু ডাক্তার কি করিবে? রোগের ঔষধ আছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর ত ঔষধ নাই।[১৩১]

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে শোক-বিহ্বল জমিরুদ্দীনের আর্ত-উচ্চারণ তাঁর বেদনার গভীরতাকে প্রমাণ করে—"পাঠক আর কি লিখিব? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লেখনী অগ্রসর হয়না।"[১৩২] 'শোকানল' পুস্তকে মেহেরুল্লাহ্-স্মরণে যে শোক-কবিতাটি সংকলিত হয় তা-ও হৃদয়স্পর্শী:

হায় হায় হায়। হৃদে ফেটে যায়।
অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবায়, চলিলেন হায়,
আঁধারিয়া এ ভুবন।

কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতার অনুরোধে জমিরুদ্দীন তাঁর 'সোদরপ্রতিম' মেহেরুল্লাহ্‌র একটি জীবনচরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি উল্লেখ করেছিলেন:

> হায়! আজ প্রায় ৯/১০ মাস অতীত হইল, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান বাগ্মী ও সমাজসেবক, মোসলমানদিগের উন্নতির পথ-প্রদর্শক ও সমাজ-সংস্কারক, সুকবি, সুলেখক ও ইসলামধর্ম্ম প্রচারক, সর্ব্বজনপ্রিয়

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গে অনেক সুলেখক, সুদক্ষ ও সুযোগ্য ব্যক্তি থাকিতেও, মুন্‌শী মরহুম সাহেবের জীবনী বাহির হইলনা।

ফলে এই ত্রুটি-অপনোদনের জন্য মেহেরুল্লাহ্-অনুরাগীদের অনুরোধে তিনি 'মেহের-চরিত' রচনা করেন। অবশ্য মেহেরুল্লাহ্‌র বন্ধু, সহচর, অনুগামী ও গুণগ্রাহী হিসেবে এ-কাজের তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। পরবর্তীকালে মেহেরুল্লাহর একাধিক জীবনী প্রকাশিত হলেও আন্তরিকতা, তথ্যসমাবেশ ও রচনাগুণে 'মেহের-চরিত'ই শ্রেষ্ঠ। শুধু মেহের-জীবনী রচনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, ধর্ম ও সমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত দরিদ্র-নিঃস্ব-সম্পদহীন মেহেরুল্লাহ্‌র অসহায় পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ এবং সন্তানদের শিক্ষার সহায়তার জন্য 'উপকৃত' মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট উদাত্ত আহ্বান ও আকুল আবেদন পেশ করেন। মেহেরুল্লাহ্‌র পুত্র মোখলেসুর রহমানের নিকট শুনেছি, জমিরুদ্দীন নিয়মিত মেহেরুল্লাহ্-পরিবারের খোঁজ-খবর রাখতেন। ১৩১৫ সালে যখন মেহেরুল্লাহ্‌র 'বিধবা-গঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তক পুনরপ্রকাশের দায়ে তাঁর পুত্র মনসুর আহমদ আদালতে দণ্ডিত এবং মোকর্দমার জন্য 'সর্বস্বহারা' হন, তখনও সেই দুর্দিনে সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে অসহায় এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জমিরুদ্দীন।

মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন জমিরুদ্দীন। মেহেরুল্লাহ্‌র অবর্তমানে এক বিরাট ধর্মীয়-সামাজিক দায়িত্ব বর্তায় জমিরুদ্দীনের ওপর এবং তিনি তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। আমরা পূর্বেই বলেছি জমিরুদ্দীনের জীবনে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রভাব ছিলো অপরিসীম। সমাজ-সংস্কার ও রাজনীতি বিষয়েও জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহ্‌রই অনুসারী ছিলেন। তবে সমাজচেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনায় মেহেরুল্লাহ্ অধিক অগ্রসর-চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মেহেরুল্লাহ্ ধর্মীয়-প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে পরিমাণে ভেবেছেন, জমিরুদ্দীন সেদিকে ততোখানি মনোযোগ দেন নি, তাঁর চিন্তা ছিলো এক-মুখীন এবং তা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। তবুও মেহেরুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারকে সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব জমিরুদ্দীনেরই

প্রাপ্য। ইসলামী রেনেসাঁর এই দুই ব্যক্তিত্ব ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ের মিলিত কর্মসাধনায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন অর্জন করেছিল আকাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা। তাই মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন, এই নাম দু'টি, যুক্তভাবে উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে।

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মুনশী জমিরুদ্দীনের কর্মজীবনের সূত্রপাত। খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারণা ও কার্যক্রমের বিরোধিতা করে তিনি প্রচারক ও লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর পূর্বে সীমিত ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের পক্ষ হতে খ্রীস্টান মিশনারীদের মোকাবেলার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রতি সমকালীন মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলের একটি বড়ো কারণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ এবং পুনরায় ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তন। এই 'প্রাদ্রী মওলানা'র বক্তব্য যে খ্রীস্টানসমাজ খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিক্রিয়াও যে গভীর হতো তার দৃষ্টান্ত এই আলোচনায় পাওয়া যাবে।

জমিরুদ্দীনের ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের ফলে মুসলমান সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাপ্তাইজ হওয়ার পর তিনি যখন কিছুকালের জন্য বাড়ীতে আসেন তখন স্থানীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল সে-সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন:

> ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি নিজ বাটী গমন করিয়া ৫/৬ মাস অবস্থান করিলে মেহেরপুরের সাধারণ মোসলমান সমাজে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, আর মুর্খেরা বলে যে খ্রীষ্টান লইয়া আহারাদি করিলে আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে ...।[১৩৩]

কোরআন শরীফের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে (১৮৯২) মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুনশী মেহেরুল্লাহ্।

জমিরুদ্দীনের মতো প্রতিভাবান, দক্ষ ও শিক্ষিত মিশনারীর খ্রীস্টধর্ম-ত্যাগ এবং পুনরায় ইসলামধর্ম গ্রহণের ঘটনাটি খ্রীস্টানসমাজকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে। তাঁকে প্রলুব্ধ করেও তাঁরা তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে ব্যর্থ হন। জমিরুদ্দীনের ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি মুসলমান সমাজের

বড়ো একটা অংশ সহজে মেনে নিতে পারেন নি। মুসলমান সমাজের এই মনোভাবের কথা তাঁর জবানীতেই জানা যায়:

> মুসলমান হইলাম বটে, কিন্তু নদীয়া জেলার অশিক্ষিত মুসলমানসমাজ আমাকে সমাজে লইতে অনিচ্ছুক হইল।[১৩৪]

তাঁর জীবনীকার জানিয়েছেন:

> শেখজির আশেপাশে গেঁয়ে লোক যত।
> আপস মাঝারে তারা করিল হুজ্জত॥
> শেখেরে লইয়া তারা চলিতে না চায়।
> খাওয়া-পেওয়া না করিবে এক বিছানায়॥
> জেয়াফত না করিবে কাম কারবাবে।
> দেখহ নাদানী কেয়ছা করে লোক সারে॥[১৩৫]

তবে মুসলমান বিদ্বদ্‌সমাজ জমিরুদ্দীনের এই প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

সমকালীন সমাজের প্রতিক্রিয়ার একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে জমিরুদ্দীনের রচনা-প্রসঙ্গ। জমিরুদ্দীনের 'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশ-খবরী' প্রথমে প্রবন্ধাকারে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। বৈশাখ ১৩১৬ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি খ্রীস্টান-মহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের (১৩১৮) 'বিজ্ঞাপনে' জমিরুদ্দীন সেই প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন:

> কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদক পাবনার পাদরী গোল্ড স্যাক্ সাহেব আমার পুস্তকের একখানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করেন, এবং এপিফ্যানি কাগজের সম্পাদক ১৯০৯ এর ১২ই জুন এবং ১৯শে জুনের এপি-ফ্যানিতে আমার পুস্তকের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাদের প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর লিখিলাম এবং আপত্তি খণ্ডন করিলাম।

১৩৩১ সালে (৭ আগষ্ট ১৯২৪) মেহেরপুরের ভবেরপাড়ায় একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুরের উকিল মোহাম্মদ মোহসেনের সভাপতিত্বে

মুন্‌শী জমিরুদ্দীন প্রধান বক্তা ছিলেন এই সভায়। এখানে ভবেরপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীদ্বয় মার্কী ও কুরুনী বিরচিত 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' (১৮৯৯) নামে একটি পুস্তক তাঁর হস্তগত হয়। বইটিতে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও ইসলামধর্ম সম্পর্কে কুৎসা প্রচার ও কুরুচিপূর্ণ আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে হজরতের চরিত্র সম্পর্কে অশ্লীল ও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। জমিরুদ্দীন উক্ত সভাতেই এই বইয়ের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন। পরে মেহেরপুরের এক সভায় এই আপত্তিকর বইয়ের প্রতিবাদে পুস্তক রচনা ও মোকর্দমা দায়েরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জমিরুদ্দীনের অনুরোধে এ-বিষয়ে ফুরফুরার পীরসাহেব মুহম্মদ আবুবকর 'ইসলামধর্ম্মে পাদ্‌রি ভীষণ আঘাত' শিরোনামে একটি 'বিজ্ঞাপনে'র দশহাজার মুদ্রিত কপি প্রচার করেন। এতে উক্ত বইয়ের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এর প্রতিবিধানের জন্য মুসলিম সমাজের কাছে আহ্বান জানানো হয়। জমিরুদ্দীনের উপর প্রতিবাদ-পুস্তক রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

উপরি-উক্ত বিষয়ে মুন্‌শী জমিরুদ্দীন ও মোহাম্মদ মোহসেনের যৌথ-স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি 'মোহাম্মদী', 'শরিয়ত', 'মোসলেম-দর্পণ' ও The Mussalman' পত্রিকায় প্রচারিত হয়। এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে 'The Mussalman' ও 'মোসলেম-দর্পণে' বিশেষ নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার অনুসরণে অন্যান্য পত্রিকাতেও এ-বিষয়ে আলোচনা হয় এবং কোনো কোনো স্থানে প্রতিবাদ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সরকারের টনক নড়ে এবং বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে ১৯২৫ সালে এক ইস্তাহার (কমিউনিক) প্রকাশিত হয়। এতে সরকার 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' গ্রন্থের বক্তব্যে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় অনুভূতি আহত হওয়ার বিষয়কে যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমনের কারণে জানান যে, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত পুস্তকটি বিগত ১৫ বছর পুনর্মুদ্রিত হয় নি এবং এর প্রকাশক ২৩ বছর পূর্বে পরলোকগমন করেছেন।[১৩৬] যাহোক, জমিরুদ্দীন ও মোহসেনের প্রচারিত বিজ্ঞাপনই এসব বাদ-প্রতিবাদের উৎস। এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়, বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বোপরি সরকারও এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রী রাউস রচিত 'মোহাম্মদের বয়ান' পুস্তকে হজরত মোহাম্মদ (স:) সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ বিবরণ ও মন্তব্য থাকায় এর প্রতিবাদে মুন্শী জমিরুদ্দীন সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে 'পাদরীর স্বরূপ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ (১ ফাল্গুন ১৩৩১) করেন। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে ঢাকার পাদ্রী এল. নেডেল জোন্স 'মোহাম্মদী'তে তাঁর জবাব লেখেন (২৯ ফাল্গুন ১৩৩১)। তাতে পাদ্রী জোন্স স্বীকার করেন যে, এই ধরনের পুস্তকের মাধ্যমে পরধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করে "সত্যধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারেনা"। এরপর জমিরুদ্দীন ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সালের সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে 'ইসলামে পাদ্রীর ভীষণ আঘাত' নামে পাদ্রী যাকুব কান্তিনাথ বিশ্বাস রচিত 'ইসলামদর্শন' পুস্তকের সমালোচনা করে এক নিবন্ধ রচনা করেন। এই 'ইসলামদর্শনে'ও যথারীতি ইসলামধর্ম ও হজরত মোহাম্মদ (স:) সম্পর্কে আপত্তিকর, অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য করা হয়। জমিরুদ্দীনের যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ করে নেডেল জোন্স 'মোহাম্মদী'তে (১৯ আষাঢ় ১৩৩২) উল্লেখ করেন:

> আমি নিজে এই বইখানি আদৌ পড়ি নাই।...তথাপিও বই হইতে উদ্ধৃত বাক্যের দ্বারা বুঝিলাম যে, ইহাতে আপত্তিজনক বিষয় লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি ট্র্যাক্ট বুক সোসাইটীর সেক্রেটারী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এখন আপনাকে সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বইগুলি আর বেচিতে দিবেননা। এবং তাঁহার হাতে যেগুলি আছে তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই বইগুলি মোসলমানদের মনে আঘাত দিয়াছে বলিয়া আমি দু:খিত।[১৩৭]

জমিরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় এভাবে খ্রীস্টান-রচিত বিদ্বেষপূর্ণ কোনো কোনো পুস্তক খ্রীস্টিয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আর্য পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী সদানন্দ বৈশাখ ১৩৩২ সালে 'সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা ওঁ এলার্মবেল' নামে "হজরত রসুলে পাক মোহাম্মদ মোস্তফার (দ:) অযথা ও জ্বলন্ত মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ একখানি পুস্তক লিখিয়া পবিত্র এসলামে ভীষণ আঘাত ও মোসলেমহৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ" করেন। জমিরুদ্দীন এর তীব্র প্রতিবাদ করে 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৩২) 'মোসলেম-হৃদয়ে দারুণ শেল।' স্বামী সদানন্দের

শয়তানী' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই বই সম্পর্কে জমিরুদ্দীন মুসলমান সমাজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান :

> ...সমস্ত পুস্তকখানিই কুৎসা ও গালাগালিতে পূর্ণ, এবং মোসলমানদিগকে ভণ্ড, পাষণ্ড ধূর্ত্ত, যবন এবং ম্লেচ্ছ প্রভৃতি কোন কথাই লেখক বাকী রাখে নাই। যাহা হাদিছ্ কোরাণে নাই, ফেকাহ অথবা কোন ইতিহাসে নাই সেই ভিত্তিহীন, জ্বলন্ত মিথ্যা কথা প্রচার ও সমগ্র জগতের মোসলমানের অন্তর্দাহ করিয়া হিন্দু-মোসলমানের মিলনের পথ সমূলে বিনষ্ট এবং উভয় জাতির মধ্যে বৈরীভাব সংস্থাপন করিবার কি যে মহৎ উদ্দেশ্য মোসলেম-শত্রু স্বামীজির অন্তরে বিদ্যমান আছে, তাহা সাধারণের জ্ঞানের অগোচর। এ বিষয়ে আমরা সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মোসলমানগণ; গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া এই পুস্তকের প্রতিবাদ করুন এবং যাহাতে এই পুস্তক চিরতরে বাজেয়াপ্ত ও লেখকের কঠিন শাস্তিবিধান হয় সে সম্বন্ধে সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুনয় করুন।[১৩৮]

জমিরুদ্দীনের এই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকায় 'সদানন্দ-গ্রেপ্তার' শিরোনামের সংবাদে জানানো হয় :

> বিগত চৈত্র মাসের [১৩৩২] "শরিয়তে-এসলাম" "মোসলেম-হৃদয়ে দারুণ শেল" শীর্ষক প্রবন্ধে আর্য্য পরিব্রাজক স্বামী সদানন্দকৃত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং এসলামধর্ম্মের অযথা কুৎসাপূর্ণ "এলার্ম বেল—সতর্কীকরণ" নামক পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহা জ্ঞাত হইয়া ১৫৩ ধারা জারীকরতঃ সি. আই. ডি. পুলিশ দ্বারা গত ১লা জুলাই তারিখে স্বামী সদানন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঁচশত টাকার জামীনে খালাস দিয়াছেন।[১৩৯]

বিচারে উক্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত এবং সদানন্দের ছ'মাসের কারাদণ্ড হয়।[১৪০]

রচনা-নিদর্শন

সিরাজ সমাধি দর্শনে

[অপ্রকাশিত কবিতা]

কোন শান্তি-সাধনায় মগ্ন তুমি আজ,
হে বঙ্গ-গৌরব-রবি নবাব সিরাজ !
পার্শ্বে তব মাতামহ আলিবর্দ্দী খান,
জুড়াতে তোমার ক্লান্ত অনুতপ্ত প্রাণ
তোমার ভগন স্বরে মিশাইয়া তান,
গাহিছে অনন্ত গীতি। এ খোশবাগান
ব্যথিতের অশ্রুজলে দিতেছে প্লাবিয়া
পথিক দাঁড়ায় আসি স্তম্ভিত হইয়া।
হে সিরাজ ! মহাবীর ইস্‌লাম-রতন,
সুপ্ত শান্তিধামে হায় বসি অনুক্ষণ
এখনও কি ভাব দেব আমাদের তরে,
এখনও কি বঙ্গরাজ্য কভু মনে পড়ে ?
নিয়তির কাল-চক্রে হ'য়ে পতিত,
যদিও হে হ'লে তুমি অকালে নিদ্রিত।
তথাপি ওখান হ'তে ক'রো আশীর্ব্বাদ,
যেন মোরা ভুলে যাই সন্তাপ বিষাদ।
শান্তি দেবী নিত্য আসি দিন দরশন,
তুমিও ভুলিয়া যাও "সংসার স্বপন"।
পথিকের দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রুজলে
দয়া করে উপহার লও পদতলে।

পূর্ণচন্দ্র

পূর্ণিমার নিশি আজি কিবা মনোহর।
হাসি হাসি পূর্ণশশী, নীল নভোভালে বসি,
তুষিতেছে কর দানে চকোর নিকর,
পূর্ণিমার নিশি আজি কিবা মনোহর।

পরেছে ধরণী ধনী কৌমুদী-বসন,
চারুমুখ হাসিভরা, কান্তি কিবা মনোহরা,
আনন্দে মাতিয়া করে চাঁদে সম্ভাষণ,
ভাব ভরে মাতোয়ারা, কি সুখমিলন।

নয়নরঞ্জন শশী হেরিয়া আকাশে,
স্বচ্ছে সরোবর জলে, আহা মরি কুতুহলে,
কুমুদিনী কত সুখে বদন বিকাশে,
অধরে ধরেনা হাসি মনের উল্লাসে।

যেদিকে নেহারি, হেরি উজ্জ্বলতাময়।
বৃক্ষপত্র ফলদলে, নদীর নির্ম্মল জলে,
শ্যামল প্রান্তরে, নগ-শিরে, সুধাময়
পড়েছে চাঁদের আভা, শোভা অতিশয়।

বহিতেছে মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ,
পরিমল ধনে ধনী, যৌবনে যেমতি ধনী,
কতই গরবে আহা করে বিচরণ,
পরধন হরি বল কে সুখী এমন?

খেলিছে সরসী হোথা চাঁদেরে লইয়া,
ক্ষণে রাখে ক্রোড়'পরে, ক্ষণে পুনঃ বক্ষে ধরে,
ক্ষণে হাসে চারুমুখ আদরে চুমিয়া,
খেলিছে সরসী রঙ্গে চাঁদেরে লইয়া!

তবু তব রূপশশি ! নিষ্কলঙ্ক নয়,
খুঁজিয়াছি চারিধার, দেখেছি জেনেছি সার,
কলঙ্ক-বিহীন কিছু নাহি বিশ্বময়,
নিষ্কলঙ্ক বল ভবে কাহার হৃদয় ?

জাননা চাতুরী কিন্তু তুমি শশধর !
এস যদি নেমে ভবে, শিক্ষা কত পাও তবে,
কেমনে ঢাকিতে হয় কলঙ্ক দুস্তর,
কেমনে কুরূপ হয় রূপ মনোহর।

চিরদিন নহ তুমি পূর্ণ অবয়ব,
কালি হবে দেহ ক্ষীণ, ক্রমে ক্রমে কান্তিহীন,
কদিনের তরে বল এ ছার গৌরব ?
সময়ে বিলীন আহা হবে ভবে সব !

তবে রে দাম্ভিক ! কেন এত অহঙ্কার !
বিদ্যা, যশ, মান ধন, সাধিবে কি প্রয়োজন ?
কদিনের তরে বল জগতে তোমার—
প্রিয়তমা জায়া আর কুমারী কুমার ?

চপলার প্রভা প্রায় সব সুনিশ্চয়
আছে দু-দিনের তরে, যাবে দু-দিনের পরে,
আমার বলিতে ভবে কিছুই ত নয়,
বিনা সেই সুপবিত্র ধর্ম্ম সুধাময় !!

তর্ তর্ বেগে শশী যেতেছে চলিয়া,
যেন কোন নৃপবর, সঙ্গে বহু অনুচর,
বীরদর্পে যায় চলি অরাতি দলিয়া,
সোণার কমল কিম্বা যেতেছে ভাসিয়া !

মম সুখদিন ফিরে আসিবে কি আর ?
জননীর কোলে থেকে, যবে চাঁদে ডেকে ডেকে,

দিতাম বাড়ায়ে হাত আনন্দে অপার,
কোথা সে সময়! কোথা জননী আমার!!

জলদ সহসা দেখি, চাঁদে আবরিল,
কোথা সে সুষমা আর? চারিদিক অন্ধকার।
যেন কোন নিশাচর শশীরে গ্রাসিল,
কৌমুদী বিরহে তাই প্রাণ তেয়াগিল!

দেখিয়া চাঁদের দশা ভাবিলাম মনে,
মরণ আসিবে কবে; কোনদিন যেতে হবে,
ত্যজিতে হইবে সব, পুত্র পরিজনে;
সময় থাকিতে ধর ইস্‌লামে যতনে।

['লহরী': ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৭]

গজল

১। দেখ দেখ সভ্যগণ,
এ কি শুভ-সম্মিলন,
জীবনে এ শুভক্ষণ,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

২। দেখেছ কি হেন দিন,
একাসনে সমাসীন,
ধনী গণি দীনহীন,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

৩। হিন্দু আর মোছলমানে,
এক মনে এক প্রাণে,
সম্মিলিত একস্থানে,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

৪। তৌয়াগিয়া দলাদলি,
হ'য়ে সবে গলাগলি,
এস গো সকলে বলি,
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

৫। ছেড়ে সব অপকর্ম্ম,
বুঝহে ধর্ম্মের মর্ম্ম,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা।

['আসল বাঙ্গালা গজল']

হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা

অন্তিম নবী হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লামের নিষ্পাপ থাকা না থাকা প্রশ্ন লইয়া বর্ত্তমানকালে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (সঃ)এর নিষ্পাপ থাকা সম্বন্ধে কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে পাদ্রী সাহেবেরা কোরাণ শরীফের কয়েকটা আয়েতের অযথা ব্যাখ্যা এবং তৎসম্বন্ধে অযথা মত প্রকাশ করতঃ বর্ত্তমান আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

যাহা হউক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) নিষ্পাপ কি না এই প্রশ্নের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ পাপ কি? এবং তাহা কয় প্রকার? হজরত মোহাম্মদের (সঃ) পূর্ববর্ত্তী নবীগণ নিষ্পাপ ছিলেন কি না? এই সকল বিষয়ের সমালোচনা করা আবশ্যক। তৎপর আমরা আমাদের নবী-কুলমণি যে নিষ্পাপ তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। সদাপ্রভু ঈশ্বর (খোদাতায়লা) খোদাতায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক, খোদাতায়ালার অসন্তোষ উৎপাদক, খোদাতায়ালার অবমাননাকর যে কোন বাক্য বলা কিম্বা কার্য্য করা এবং প্রকাশিত বাক্যনিচয়ের অন্তর্গত আদেশ-চক্রের (শরা-শরিয়ত) বহির্ভূত হওয়াই পাপ।

পাপ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে কতকগুলি "মৃত্যু-জনক" আর কতকগুলি মৃত্যুজনক নহে; যেমন সাধু যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায় ১৬ পদ হইতে লিখিত আছে, "যদি আপন ভ্রাতাকে পাপ

করিতে দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নহে, তবে সে যাচ্ঞা করিবে এবং উহাকে, যাহার পাপকর্ম্ম মৃত্যুজনক নহে, এমন লোককে জীবন দিবে। মৃত্যুজনক পাপও আছে, তাহার বিষয় তাহাকে বিনতি করিতে হয় ইহা বলিমা। যাবতীয় অধার্ম্মিকতা তো পাপ; পরন্তু যাহা মৃত্যুজনক নহে, এমন পাপ আছে।"

ইস্লামিক বিশ্বাসানুসারে নবীগণ সর্ব্বপ্রকার 'মৃত্যুজনক' পাপ হইতে সুরক্ষিত ও বিমুক্ত (মাসুম) অর্থাৎ নিষ্পাপ।...

['মাসুম মোস্তফা']

হজরত ইসা কে?

হজরত ইসা আলায়হেচ্ছালাম কে? এতৎসম্বন্ধে বিচার ও মীমাংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে; কেননা আজকাল ইসাই বা খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ প্রায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই হজরত ইসা (আলাঃ)কেই একমাত্র 'নাজাৎ দেহান্দা' বা ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রচার এবং বহুতর হিন্দু ও মুসলমান নর-নারীর হৃদয়-ক্ষেত্রে ঐ বিশ্বাস-বীজ বপন করিয়া থাকেন।

ইসাই বা খ্রীষ্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, হজরত ইসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর; স্বয়ং জগৎ-পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর, মানবকে পাপী বা গোনাহ্গার দেখিয়া, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ কফ্ফারা বিধানার্থ নিজেই বিবি মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ ও "ইসা" নামধারণ করিলেন; এবং ৩৩ বৎসর-কাল জগতে থাকিয়া নানাবিধ উপদেশ প্রদান ও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করণান্তে শেষে ইহুদীদিগের হস্তে ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার তৃতীয় দিবসে জীবিত (জেন্দা) হইয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক, খোদাতালার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া ওম্মতের জন্য মোনাজাত (অনুরোধ) করিতেছেন।

এখন যে কেহ সেই ইসাকে খোদাতালার অবতার এবং ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তিনি আর কোনও পুণ্য (নেক) কাজ না করিলেও স্বর্গে (বেহেশ্তে) যাইবেন। ইসাই মিসনে টাকার অভাব নাই; তাই ঐ মিসনসমূহ অনেক বেতনে পাদ্রী ও প্রচারকগণকে নিযুক্ত করিয়া দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে ঐ কথা প্রচার করাইতেছেন; পাদ্রিদিগের সেই সুমধুর প্রচারে ও স্বর্গের প্রলোভনে অনেক সরল বিশ্বাসী হিন্দু ও মুসলমান ইসাই দলে

ভর্ত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ইসাই এবং অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ-রূপে মীমাংসা হওয়া আবশ্যক যে, হজরত ইসা কে?

বাইবেল শাস্ত্রে জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে যথা—"একমাত্র ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ আছেন; তিনি মনুষ্য ইসা।" ইঞ্জিল—১ম তীমথীয় পুস্তক ২ অধ্যায় ৫ পদ। হজরত ইসা যে খোদাতালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি ও মনুষ্য, উপরোক্ত বাইবেলের বচনটিতে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

শত শত দলে বিভক্ত প্রায় সমুদয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীই খোদাতালার প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব হজরত ইসার প্রতি বর্ত্তাইয়া থাকেন। রোমান ক্যাথলিক-দিগের গির্জ্জাঘরসমূহে মেরীর (বিবি মরিয়মের) এবং হজরত ইসার প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সে সকল প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে দীপ জ্বালান ও ধূপের সুগন্ধ বিস্তার করা হয়। হজরত ইসা ও তাঁহার মাতার নামে স্তোত্রাদি পঠিত এবং তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা (মোনাজাত) করা হইয়া থাকে। প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের গির্জ্জাসমূহে ঐরূপ প্রতিমূর্ত্তির পূজা না হইলেও, তথায় যে হজরত ইসাকে খোদাতালার আসনে বসান হইয়া থাকে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টানদিগের মতে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, এই ত্রিত্বময় তিনজন ঈশ্বর আছেন: এই কারণবশতঃ খ্রীষ্টানদিগকে ত্রিত্ব পূজক বা 'তস্‌লিস পরস্ত' বলা হইয়া থাকে।

তাহাদের যীশুপূজার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইলে স্পষ্টই বোধ হয়, যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খোদাতাআলার সহিত তাহাদিগের আর কোন সম্বন্ধ নাই। যেন তিনি খ্রীষ্টানমণ্ডলীর নিকট হইতে জরা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ চিরকালের জন্য অবসরগ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাদিগের সঙ্গীত কীর্ত্তনাদিতে প্রায় শুনা যায় যে, পুত্র ঈশ্বরই পাপীর ত্রাণকর্ত্তা; একমাত্র পুত্রেরই কর্ত্তৃত্ব ও প্রভাব। খ্রীষ্টানগণ সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনকালে কেবল যীশুমহিমা গাইয়াই প্রায় পালা শেষ করিয়া থাকেন; সর্ব্বোপরিস্থ খোদাতালার গুণকীর্ত্তন তাহাদিগের নিকট প্রায় শুনা যায়না।

এইসকল খ্রীষ্টানগণ আবার হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা ও ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে শক্তি. শিব, রাধা, কৃষ্ণ ইত্যাদির পূজা

পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের পূজা করিতে আহ্বান করিতেও ত্রুটি করেননা। তাহাদের মতে ঈসাই পূর্ণ ও সত্যময় খোদাতালা, আর সকলই অসার ও অসত্য। আমরা মুসলমান (একেশ্বরবাদী), হজরত ঈসা যে একজন ঈশ্বর-পরায়ণ পয়গম্বর (তত্ত্ববাহক) ছিলেন, তাহাতে আমাদের অটল বিশ্বাস আছে। তিনি খোদাতালা হইতে যে ইঞ্জিল কেতাব পাইয়াছিলেন, আমরা তাহাও বিশ্বাস করি। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যে হজরত ঈসাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন—ভাল, হজরত ঈসা কি কখনও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? না, কদাচ নয়। বরং তাহার বিপরীত কথায় বাইবেলখানি পরিপূর্ণ। ঐ অসঙ্গত উক্তিটী কেবল খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মন:কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাহারা বাইবেলের কোন কোন বচনের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াই হউক, কিংবা ধর্ম্মগুরুকে গৌরবান্বিত করণের মানসেই হউক, তদ্দ্বারা হজরত ঈসাকে খোদাতালার স্থলাভিষিক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন; তাঁহারা কদাচ ভাবেন না যে, ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুকে মহাসাগর এবং ধূলিকণাকে পর্ব্বত বলিয়া বর্ণন বা কল্পনা করিলে, বাস্তবিক তাহা হয়না; বরং কল্পনা-কারী হাস্যাস্পদ হইয়াই থাকেন।

হজরত ঈসা খোদাতালার নিকটে সামান্য শিশির বিন্দু ও ক্ষুদ্র ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কিনা; নিরপেক্ষ পাঠকমণ্ডলীই তাহার সুবিচার করিবেন।

['হজরত ঈসা কে?']

মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ

১৩ই বৈশাখ [১৩১৬] সোমবার প্রাতঃকালে দেওয়ান বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমরা সদলবলে খোসবাগে গমন করিলাম. খোসবাগ মুর্শিদা-বাদের অপর পারে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এই উদ্যানে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবর আছে। আমরা কবরদ্বয় জেয়ারৎ করিয়া কারবালা দিয়া মতিঝিলে গমন করিলাম।... প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর অতীত হইল মতিঝিল মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, মতিঝিল বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত।...

...জাফ্রাগঞ্জের নবাববাটীর ভিতরে যে স্থানে সিরাজ হত হইয়া-ছিলেন, সেই স্থান দর্শন করি। সিরাজের হত্যা স্থানে একটী নিমের গাছ

ছিল, গাছটী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে। যে গৃহে সিরাজ হত হইয়াছিলেন, সেই গৃহের পশ্চিমে ১টী জাম ও ২টী কাঁঠালগাছ আছে, পূর্ব্বে প্রাচীর ও রাস্তা বর্ত্তমান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হিরাঝিলে গমন করি। এই হিরাঝিলেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার আসল প্রাসাদ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাক্ষসী ভাগীরথী তাহা গ্রাস করিয়াছে; কেবল ঝিলের বাঁধাঘাটের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই হিরাঝিলে সিরাজের প্রকাশ্য ধনাগারে এক কোটী ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, বাত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স অলঙ্কার-খচিত হিরা-জহরৎ ও ২ বাক্স অখচিত চুনিপান্না প্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড এককালে মৌজুদ ছিল। হায়! কালের কুটিলা গতিতে সকলই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।...

১৪ই বৈশাখ মুর্শিদাবাদ হইতে পলাশী গমন করি, মুর্শিদাবাদ রেললাইনের পলাশী ষ্টেশনটী কলিকাতা হইতে প্রায় ৯৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে ভাগীরথী নদীর তীর পর্য্যন্ত একটী পাকা সড়ক প্রস্তুত হইয়াছে, এই পথ প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত...। এই নব-নির্ম্মিত পথটী পশ্চিমাভিমুখিন্ এবং ইহার দুই পার্শ্বেই যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রটি কালি করিলে বোধহয় ৪/৫ মাইল হইবে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের স্থানে স্থানে রেলদ্বারা বেষ্টিত প্রায় ৫০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগুলি ইংরেজ ও নবাব সৈন্যের শিবির স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটীর গায়ে লোহার পাতে ইংরেজী অক্ষরে কোনটীতে "মীরজাফরের সৈন্যের বাম অংশ", কোনটীতে "ইয়ার আলিফের সৈন্যের দক্ষিণ অংশ", কোনটীতে "আম্রকাননের উত্তরভাগ", কোনটীতে "আম্রকাননের উত্তরপূর্ব্ব ভাগ", কোনটীতে "ব্রিটিশের অগ্রগামী কামান", ইত্যাদি নানা কথা লিখিত আছে। ভাগীরথী-তীরে কয়েকটী ইষ্টকনির্ম্মিত নকল কামান সারি সারি সজ্জিত থাকিয়া ব্রিটিশ-সিংহের বজ্রনাদী আসল কামানের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পলাশী গ্রামটী এই নূতন রাস্তার বামদিকে অবস্থিত। এই গ্রামে ন'কড়ী মণ্ডল নামে একজন বৃদ্ধ আছেন। ইহার মুখে পলাশীসংক্রান্ত অনেক প্রাচীন কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৩ সালে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী মনোমেন্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯০৫ সালে আর একটী সুবৃহৎ মনোমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। এই মনোমেণ্টে ইংরেজী অক্ষরে Battle field of Plasey ; June 23/1757 লেখা আছে। পরলোকগত সার জন উডবরন্ ১৯০২ সালে পলাশী দর্শন কারিতে গমন করেন, সেইসময়ে

তিনি ন'কড়ী মণ্ডলের সহিত আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য এক প্রকাণ্ড লাঠী প্রদান করেন। সেই লাঠীর মাথা, তলা ও গিরাগুলি রৌপ্যের দ্বারা সুন্দররূপে বাঁধান এবং ইহার মধ্যস্থলে রূপার পাতে ইংরাজিতে লিখিত আছে,
"Nakari Mondal, from Sir John Woodburn, 8th August. 1902"...

পলাশীর প্রাঙ্গন চাষ দিবার সময় আজও কৃষকেরা অনেক গোলাগুলি পাইয়া থাকে। পলাশী হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে মাজনপাড়া নামক গ্রামে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মির মদনের সমাধি আজও বর্ত্তমান আছে।...

['বাসনা' : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬]

পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ

মহাকবি হাফেজের বিবরণ

মহাকবি খাজা হাফেজ সামসুদ্দীন, সুবিখ্যাত কবি শেখ মস্‌লেহুদ্দীন সাদির ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য দেশের অন্তর্গত সিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি সন্ধ্যাকালে এক সমাধি-মন্দিরে নিয়ত আলো দান করিতেন। এক দিন যাইয়া দেখেন, কয়েক জন আরেফ (যোগী) ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তিনি ধ্যানস্থিত আরেফদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরে তাঁহাদের নিকটে কিছু কিছু ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন। সেই হইতেই তিনি এক স্বর্গীয় নূতন জীবন প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরপ্রেমে একেবারে প্রমত্ত হইয়া যান এবং "গজল" নামক কবিতাবলীতে গভীর প্রেমের নানা সুমিষ্ট বচন বলিতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি মজ্জুব (প্রেমোন্মত্ত) ছিলেন; অর্থাৎ শরিয়তের অধীন হইয়া আমাদিগের ন্যায় রোজা ও নামাজ পড়িতেন না। সর্ব্বদা ধ্যানেই নাকি নিমগ্ন থাকিতেন। যতকাল জগতে পারস্য ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল তাঁহার বিরচিত "দেওয়ান হাফেজ" গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। হাফেজের অনেক কথাই রূপক; তিনি "দেওয়ান হাফেজে" বলিয়াছেন, "দরবেশী পরিত্যাগ করিয়া সুরালয়ে গিয়া সুরা পান কর। প্রতিমা পূজা কর, অগ্নি পূজকের শিষ্য হও।" ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিগর্হিত কথা বলাতে লোকে তাঁহাকে কাফের বলিয়া মনে করিত।

তৎকালের লোকেরা তাঁহাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিত। তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানে অনেকে অনিচ্ছুক ছিলেন ও তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য আলেমগণের মধ্যে মহা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। পরিশেষে হাফেজ কিরূপ উক্তি সকল লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে সকলে ইচ্ছুক হন। প্রথমে এই ভাবের একটী কবিতা তাঁহাদের নয়ন গোচর হয়। "হাফেজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য যাত্রা করিতে চরণকে সঙ্কুচিত করিও না, সে যদিও পাপে নিমগ্ন ছিল, কিন্তু স্বর্গলোকে যাইতেছে।" এই কবিতা পাঠ করিয়া সকলেই তাঁহার জানাজা পড়িলেন ও তাঁহাকে কবর দিলেন। পরে তাঁহার অন্যান্য গজল পাঠে তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। অনন্তর সমুদয় গজল গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইল।

সিরাজ নগরে মসল্লা নামক স্থানে হাফেজের সমাধি বিদ্যমান। তাহা এক তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। নানা স্থান হইতে যাত্রিক সকল তাহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।

মহাকবি শেখ সাদীর বিবরণ

একাদশ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে পারস্য রাজ আবুবকর শাহের রাজত্বকালে সিরাজ নগরে শেখ মসলেহুদ্দিন সাদী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি এক জন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন। জীবনের প্রায় ৩০ কাল দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ১২২০ খৃঃ অব্দে বোস্তাঁ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোস্তাঁর অনেক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, আমার কৃষ্ণ কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।*

আমাদের পবিত্র কোরাণ শরিফ যে দেশে ও যে স্থানে গিয়াছে, মহাত্মা শেখ সাদীর 'পান্দেনামা", "গোলেস্তাঁ" ও "বোস্তাঁ" ও প্রায় সেই দেশে গিয়াছে। তাঁহার লিখিত পুস্তকের দ্বারা যেমন নীতি শিক্ষা করা যায়, এমন

---

* সম্ভবতঃ মহাকবি শেখ সাদী (রহঃ) ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন।
* তাঁহার বিস্তৃত জীবনী উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। (সম্পাদক)

আর কোন ও পুস্তকের দ্বারাই পারা যায়না। দুঃখের বিষয়, এমন মহাত্মার পূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

শেখ জমিরুদ্দীন।

ইস্লাম-প্রচারক।

['ইসলাম-প্রচারক' : ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮]

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা জেলার অন্তর্গত পাঁচদোনা নামক পল্লীতে, ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মাধবরাম রায়। সেন জাতীয় পদবী, কিন্তু দেশে ইঁনি রায় বলিয়া পরিচিত। ঢাকা জেলায় পাঁচদোনা পল্লীর বৈদ্য বংশ সম্ভুত জমিদারেরা বিশেষ বিখ্যাত। মাধবরাম রায় ঐ জমিদার মহাশয় দিগের বংশধর ছিলেন।

গিরীশ বাবু প্রথমতঃ পাঠশালাতে লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা করণার্থ টোলে প্রেরণ করেন। ২২।২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁনি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার কোন পারিবারিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইঁনি প্রায় ১৫ বৎসর কাল কেশব বাবুর সহিত বাস করেন ও তাঁহার সহিত নানা-স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান।

৩৫।৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গিরীশ বাবু লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করিয়া, শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধ মৌলবী এহ্সানুল্লা সাহেবের নিকটে প্রায় এক বৎসর কাল আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন, পরে কলিকাতা ও ঢাকাতে অবস্থিতি করিয়া কোন কোন আলেমের নিকটে নিয়মিতরূপে আরবী ও পারসী অধ্যয়ন করেন। তৎপর আজ প্রায় ৩১।৩২ বৎসর অতীত হইল, ইঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই—সন্তান সন্ততি কিছুই নাই। আজ কাল ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন, কিন্তু সমাজের নিকট হইতে কিছুই লয়েন না। ইঁহার কৃত গ্রন্থাবলীর আয় ও সমাজের হিতার্থে উৎসর্গীকৃত। দেশে যে জমিদারী আছে, তাহার আয় হইতে ইঁনি কিছু পান, তদ্দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

"ইস্‌লাম-প্রচারকের" পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, ইস্‌লামী কাগজে ব্রাহ্মের জীবনী কেন? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ইতিহাসের সহিত গিরীশ বাবুর জীবনীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আজ ইস্‌লাম প্রচারকে তাঁহার জীবনীর প্রচার হইল। বঙ্গদেশ খৃষ্টান মিসনারীরা অনেক দিন হইতে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ও কত শত মুসলমান যুবককে খৃষ্টানীর দিকে টানিতেছিলেন, কিন্তু যে দিন বঙ্গীয় মুসলমান যুবক গিরীশ বাবুর "বঙ্গানুবাদিত কোরাণ শরিফ" ও "হজরতের জীবনী" হস্তে পাইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মের দিকে টান পড়িয়াছে। আর খৃষ্টান, হিন্দু ও ব্রাহ্ম ইস্‌লামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

বঙ্গদেশে লক্ষাধিক মৌলবী থাকিতে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাবলী গিরীশ বাবুর পূর্ব্বে কেহ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমাদের মৌলবী সাহেবগণ কেবল 'ছায়ের' করিয়া ফকির হইতেছেন, আর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ধনী হইতেছেন, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?...

['ইস্‌লাম-প্রচারক': কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৮]